ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম-১ (ঈমান)

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

৯০৩

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ শাহেদ আল-কাফী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فتاوى أركان الإسلام

[الإيمان]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: عبد الله بن شاهد المدني

محمد عبد الله الكافي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	ভূমিকা	
২.	শাইখ ইবন উসাইমীন রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	
৩.	**অধ্যায়: ঈমান** كتاب الإيمان	
৪.	তাওহীদ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী?	
৫.	মক্কার কাফিরদের শির্ক কোন ধরণের ছিল?	
৬.	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি কী?	
৭.	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কারা?	
৮.	জান্নাতী দলের পরিচয়	
৯.	নাজাত প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য কী?	
১০.	দীনের মধ্যে মধ্যম পন্থা বলতে কী বুঝায়?	
১১.	আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট ঈমান অর্থ কী? ঈমান কি বাড়ে এবং কমে?	
১২.	হাদীসে জিবরীল এবং আবদুল কায়েসের হাদীসের মধ্যে সমন্বয়	
১৩.	ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে	
১৪.	মসজিদে আসার অভ্যাস আছে, এমন ব্যক্তিকে কি আমরা মুমিন হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারি?	
১৫.	আল্লাহ সম্পর্কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রনা)	
১৬.	কাফেরের ওপর কি ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব?	
১৭.	যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব দাবী করবে, তার হুকুম কী?	
১৮.	মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহই ভালো জানেন।	
১৯.	সূর্য ঘুরে না পৃথিবী?	
২০.	আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি	

	ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী?	
২১.	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কীভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?	
২২.	মানুষ এবং জিন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?	
২৩.	আল্লাহর কাছে দো'আ কবূল হওয়ার শর্ত	
২৪.	ইবাদতে ইখলাস এবং জান্নাত লাভের কামনা	
২৫.	আশা এবং ভয়ের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতামত কী?	
২৬.	উপায় গ্রহণ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়	
২৭.	ইসলামে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুম কী?	
২৮.	ঝাড়-ফুঁকের বিধান কী? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কী?	
২৯.	ঝাড়-ফুঁক করা কি আল্লাহর ওপর (তাওয়াক্কুল) ভরসার পরিপন্থী?	
৩০.	তাবীজ ব্যবহার করার হুকুম কী?	
৩১.	পানাহারের পাত্রে চিকিৎসাস্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোনো আয়াত লিখে রাখা জায়েয আছে কী?	
৩২.	কোনো প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা।	
৩৩.	আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা	
৩৪.	আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?	
৩৫.	আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরে আছেন। একজন নারীর সাক্ষ্য	
৩৬.	তা'আলা সুউচ্চ 'আরশের উপরে আছেন	
৩৭.	'আল্লাহ 'আরশের উপরে উঠেছেন' এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা	
৩৮.	কখন ইনশা-আল্লাহ বলতে হবে?	
৩৯.	ইরাদাহ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার?	
৪০.	আল্লাহর নামের ভিতরে ইলহাদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?	
৪১.	আল্লাহর 'চেহারা', আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি সম্পর্কে	
৪২.	আল্লাহর কোনো নাম বা গুণ অস্বীকার করার হুকুম কী?	

৪৩.	আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতোই?	
৪৪.	শেষ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন -একথার ব্যাখ্যা	
৪৫.	আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালেহীনের অভিমত কী?	
৪৬.	জিন্নের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় কী?	
৪৭.	জিন্নেরা কি গায়েব জানে?	
৪৮.	আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাবীবুল্লাহ বলার বিধান	
৪৯.	দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করার হুকুম কী?	
৫০.	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরি?	
৫১.	ইমাম মাহদীর আগমণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো কি সহীহ?	
৫২.	ইয়াজুজ-মাজুজ কারা?	
৫৩.	নবীগণ কেন উম্মাতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সাবধান করেছেন?	
৫৪.	যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে, তাদের কীভাবে বুঝানো সম্ভব?	
৫৫.	কবরের আযাব কি সত্য?	
৫৬.	স্বাভাবিক দাফন না হলেও কবরে আযাব হবে	
৫৭.	কবরের আযাব অস্বীকার করার বিধান।	
৫৮.	পাপী মুমিনের কবরের আযাব কি হালকা করা হবে?	
৫৯.	শাফা‘আত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?	
৬০.	মুমিন ও মুশরিকদের শিশু সন্তানদের পরিণাম কী?	
৬১.	জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো মহিলাদের জন্য কি আছে?	
৬২.	জাহান্নামের অধিকাংশ সংখ্যা মহিলা হওয়ার কারণ কী?	
৬৩.	তাকদীরের মাসআলা এড়িয়ে চলার বিধান	
৬৪.	মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?	
৬৫.	সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দো‘আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব?	
৬৬.	রিযিক এবং বিবাহ কি লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে?	
৬৭.	মুসিবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার হুকুম কী?	

৬৮.	রোগ কি এক জনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে স্থানান্তরিত হয়? কোনো কিছু দেখে বা শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করার বিধান	
৬৯.	বদ নজরের প্রকৃতি কি এবং তার চিকিৎসা কী?	
৭০.	আকীদার মাসআলায় কি অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে?	
৭১.	আল্লাহর আইন ছেড়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার হুকুম কী?	
৭২.	গাইরুল্লাহ-এর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করা বড় শির্ক	
৭৩.	আল্লাহ তা'আলা বা তাঁর রাসূল অথবা দীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কী?	
৭৪.	কবরবাসীর কাছে দো'আ করার বিধান কী?	
৭৫.	আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কী?	
৭৬.	জাদু কাকে বলে? জাদু শিক্ষার হুকুম কী?	
৭৭.	জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মিশের ব্যবস্থা করার হুকুম কী?	
৭৮.	গণক কাকে বলে? গণকের কাছে যাওয়ার হুকুম কী?	
৭৯.	রিয়া বা মানুষকে দেখানো বা শুনানোর নিয়তে ইবাদাত করার হুকুম কী?	
৮০.	কুরআনের শপথ করার হুকুম কী?	
৮১.	গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার হুকুম কী?	
৮২.	কবরের তাওয়াফ, কবরবাসীর কাছে দো'আ এবং তাদের জন্য নযর-মানত করার হুকুম কী?	
৮৩.	নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মসজিদের ভিতরে হওয়ার জবাব	
৮৪.	কবরের উপরে গম্বুজ নির্মাণের করা কী?	
৮৫.	মসজিদে দাফন করার হুকুম কী?	
৮৬.	নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করার হুকুম কী?	
৮৭.	কবরের মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তার চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম।	
৮৮.	প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে সালাত পড়ার হুকুম কী?	
৮৯.	ঘরের দেওয়ালে ছবি ঝুলানোর বিধান কী?	

৯০.	ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানোর বিধান কী?	
৯১.	ইসলামে বিদ'আতের কোনো স্থান নেই।	
৯২.	ঈদে মীলাদুন নবী পালনের হুকুম কী?	
৯৩.	মাতৃ দিবসের উৎসব পালন করার হুকুম কী?	
৯৪.	সন্তানদের জন্ম দিবস, বিবাহ দিবস পালন করার হুকুম কী?	
৯৫.	কোন ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গল মনে করা প্রসঙ্গে।	
৯৬.	উসীলার হুকুম কী?	
৯৭.	কাউকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার মূলনীতি কী?	
৯৮.	অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কী?	
৯৯.	যারা কাফিরদের সাথে চাকুরী করে, তাদের জন্য উপদেশ কী?	
১০০.	কাফেরদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে তা দ্বারা কীভাবে আমরা উপকৃত হব?	
১০১.	আরব উপ-দ্বীপে অমুসলিমদের প্রবেশ করানোর হুকুম কী?	
১০২.	ধর্ম প্রত্যাখ্যান-ই কি উন্নতির চাবিকাঠি?	
১০৩.	কতক লোক বলে যে, অন্তর ঠিক থাকলে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করার বেশি গুরুত্ব নেই। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?	
১০৪.	আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন -একথাটি বলা কি ঠিক?	
১০৫.	আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোনো কিছু চাওয়া জায়েয আছে কী?	
১০৬.	আপনি দীর্ঘজীবি হোন, একথা বলার হুকুম কী?	
১০৭.	একত্রে (الله) এবং (محمد) লেখার বিধান কী?	
১০৮.	আল্লাহ আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, এ বাক্যটি বলা যাবে কি না?	
১০৯.	মৃত ব্যক্তিকে মরহুম বলার হুকুম কী?	
১১০.	ভাষণের শুরুতে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে বলছি- এরূপ বলা কি ঠিক?	
১১১.	অনেক মানুষ বলে থাকে "আপনি আমাদের জন্য বরকতস্বরূপ" এভাবে বলার হুকুম কী?"	
১১২.	মানুষ বলে থাকে "তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে" এধরণের কথা বলার বিধান কী?	
১১৩.	"চিন্তার স্বাধীনতা" কথাটি কতটুকু সঠিক?	

১১৪.	মুফতীর নিকট “এ বিষয়ে ইসলামের হুকুম কী” এ ধরণের বাক্য দিয়ে প্রশ্ন করার বিধান কী?	
১১৫.	“পরিস্থিতির ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে” “তাকদীরের ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে” এধরণের কথা বলার হুকুম কী?	
১১৬.	কাউকে শহীদ বলার হুকুম কী?	
১১৭.	‘হঠাৎ সাক্ষাত হয়ে গেল’, ‘হঠাৎ এসে গেলাম’- এজাতীয় কথা বলা জায়েয কি না	
১১৮.	ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ- এধরণের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?	
১১৯.	দীনকে খোসা এবং মূল এভাবে ভাগ করা কি ঠিক?	
১২০.	“তাকে সর্বশেষ বিছানায় দাফন করা হলো” মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একথাটি বলার হুকুম কী?	
১২১.	নাসারাদেরকে মাসীহী বলা কি ঠিক?	
১২২.	‘আল্লাহ না করেন’ এ কথাটি বলার হুকুম কী?	
১২৩.	মানুষ মারা গেলে يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً এ আয়াত পাঠ করা কি ঠিক?	

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অনুসন্ধান করবে, ওটা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দীন ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। ১) এ কথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) মাহে রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং ৫) সাধ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তাই নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলিমে দীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শাইখ **মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.** ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস ও পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতামত থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব 'ফাহাদ ইবন নাসের ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান'। নাম দিয়েছেন **'ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম'**। ইসলামী জ্ঞানের জগতে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় বাংলা ভাষায় আমরা তা অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করি। তাছাড়া বাংলা ভাষী মুসলিমদের জন্য এধরণের দলীল নির্ভর পুস্তকের খুবই অভাব। তাই বইটিকে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জুবাইল দা'ওয়া সেন্টারের দা'ওয়া বিভাগের পরিচালক শাইখ খালেদ নাসের আল-উমাইরির। তিনি বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, কোনো প্রকার ভুল-ক্রটি নজরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়। হে আল্লাহ এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান কর। সকলকে মার্জনা কর এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবূল কর।

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-কাফী

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও জন্ম তারিখ:

তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ ইবন মুহাম্মাদ আত-তামীমী। তিনি হিজরী ১৩৪৭ সালের ২৭ রামাযানের রাত্রিতে সঊদী আরবের আল-ক্বাসীম প্রদেশের উনাইযা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন:

শিক্ষা জীবনের শুরুতে তিনি তার নানার কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা করেন। অতঃপর আরবী ভাষা ও অন্যান্য বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন এবং হাদীস ও ফিকহসহ কতিপয় পুস্তিকাও মুখস্থ করেন।

অতঃপর তিনি তাওহীদ, ফিকহ এবং নাহু শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করার পর শাইখ আবদুর রাহমান ইবন নাসির আল-সা‘দী রহ.-এর পাঠশালায় যোগদান করেন। সেখানে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফারায়েয, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং আরবী ব্যকরণ অধ্যয়ন করেন। যে সমস্ত শাইখদের ইলম, আকীদা এবং পাঠদান পদ্ধতির দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে শাইখ আব্দুর রাহমান ইবন নাসের আল-সা‘দী রহ. সর্বপ্রথম।

উনাইযাতে থাকাবস্থায় তিনি শাইখ আব্দুর রাহমান ইবন আলী ইবন আওদান রহ.-এর নিকট ইলমে ফারায়েয এবং শাইখ আব্দুর রাযযাক

আফীফী রহ. এর নিকট ইলমে নাহু এবং ইলমে বালাগাত শিক্ষা করেন।

রিয়াদ শহরে ইসলামিক শিক্ষা ইন্সটিটিউট খোলা হলে তিনি বন্ধুদের পরামর্শক্রমে এবং তাঁর উস্তাদ শাইখ আব্দুর রাহমান সা'দীর অনুমতিক্রমে তথায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি দু'বছর অধ্যয়ন কালে শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকীতী, আব্দুল আযীয ইবন নাসের আর-রাশীদ এবং শাইখ আব্দুর রাহমান আল-আফ্রিকীসহ অন্যান্য উস্তাদদের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পান। এ সময়ই আল্লামা ইবন বায রহ.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সহীহ বুখারী এবং ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ.-এর লিখিত বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। তিনি তার কাছ থেকে হাদীস এবং ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে যাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন ইবন বায রহ. ছিলেন তাদের মধ্যে দ্বিতীয়।

অতঃপর তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একাডেমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে উনাইযায় ফেরত এসে উনাইযা জামে মসজিদে পাঠ দান শুরু করেন। তার উস্তাদ আব্দুর রাহমান আস-সা'দী মারা যাবার পর উনায়যা জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালনসহ উস্তাদের প্রতিষ্ঠিত উনাইযা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে লাইব্রেরিতে স্থান দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় মসজিদেই ক্লাশ নেওয়া শুরু করেন। এ পর্যায়ে সউদী আরবের বাইরে

থেকেও বিপুল সংখক ছাত্রের আগমণ ঘটতে থাকে। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি অত্র মসজিদে শিক্ষা দানে ব্যস্ত ছিলেন। সাঊদী সরকারের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন।

ব্যক্তিগত আমল-আখলাক:

শাইখ একজন উঁচু মানের আলিম হওয়ার সাথে সাথে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী, নম্র এবং আল্লাহ ভীরু। জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতেন। ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে তিনি তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করতেন। তিনি মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনতেন এবং সাধ্যানুসারে তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সচেষ্ট থাকতেন। বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক সংগঠনকে তিনি বিশেষভাবে সহযোগিতা প্রদান করতেন।

দাওয়াতী কর্মতৎপরতা:

তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন আলিম এবং দাঈ‘। পৃথিবীতে এমন কোনো তালেবে ইলম পাওয়া যাবে না, যে শাইখ ইবন উছাইমীন সম্পর্কে অবগত নয়। প্রচণ্ড রোগে আক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি মক্কা শরীফে দারস এবং তা‘লীমের কাজ আঞ্জাম দিতেন। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে তিনি চিকিৎসার জন্য আমেরিকা সফরে গিয়ে বিভিন্ন ইসলামী সেন্টারে উপস্থিত হয়ে লেকচার প্রদান করেন। তথায় তিনি জুমু‘আর খুৎবা দেন এবং ইমামতি করেন। সাউদী আরব আল কুরআন রেডিওতেও তিনি নিয়মিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতেন।

ইলমী খিদমত:

‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’ ছাড়াও তার রচিত কিতাব ও পুস্তিকার সংখ্যা অনেক। তার লেখনীর মধ্যে রয়েছেঃ

১) শারহুল আকীদা আল-ওয়াসিতীয়্যাহ। ২) শারহু কাশফুশ শুবহাত। ৩) আল কাওয়ায়েদুল মুছলা ৪) শারহুল আরবাঈন আন নাবুবীয়্যাহ। ৫) কিতাবুল ইলম। ৬) আশ-শারহুল মুমতি‘ (সাত ভলিওম) ৭) শারহু ছালাছাতুল উসূল ৮) আল উছূল মিন ঈলমিল উছূল। এছাড়া রয়েছে তার আরো অসংখ্য ক্যাসেট ও ছোট ছোট পুস্তিকা, যা তার নামে প্রতিষ্ঠিত ইবন উসাইমীন কল্যাণ সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে থাকে। বর্তমানে তার ইসলামের খিদমতসমূহ ওয়েব সাইটেও পাওয়া যায়।

ঠিকানা: www.binothaimeen.com

মৃত্যু:

এ স্বনামধন্য ও বিশ্ববরেণ্য আলিমে দীন দীর্ঘ দিন ইসলামের খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পর ১৪২১ হিজরী শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখ মাগরিবের সালাতের সামান্য পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে সঊদী আরবের বাদশাহসহ রাজ পরিবারের সকল সদস্য, সে দেশের সকল আলিম এবং সর্বস্তরের জনগণ শোকাহত হন। বিশ্ব এক অপূরণীয় ক্ষতি অনুভব করে।

আল্লাহর কাছে দো‘আ করি তিনি যেন শাইখের সমস্ত দীনি খেদমত

কবূল করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান প্রদান করেন। আমীন।

অধ্যায়: ঈমান كتاب الإيمان

প্রশ্ন: (১) তাওহীদ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: তাওহীদ শব্দটি (وحد) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। 'না' বাচক ও 'হ্যাঁ' বাচক উক্তি ব্যতীত এটির বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এককক্বত বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তু হতে কোনো বিধানকে অস্বীকার করে এককক্বত বস্তুর জন্য তা সাব্যস্ত করা। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলব, "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই" একথার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত কোনো ব্যক্তির তাওহীদ পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল বস্তু হতে উলুহিয়্যাতকে (ইবাদাত) অস্বীকার করে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করবে। কারণ, শুধুমাত্র নাফী বা 'না' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে গুণাগুণ থেকে মুক্ত করা হয়। আর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বাচক বাক্যের মাধ্যমে কোনো বস্তুর জন্য কোনো বিধান সাব্যস্ত করলে সেই বিধানে অন্যের অংশ গ্রহণকে বাধা প্রদান করে না। যেমন. উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি বলেন, 'অমুক ব্যক্তি দাঁড়ানো'। এ বাক্যে আপনি তার জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন। তবে আপনি তাকে দণ্ডায়মান গুণের মাধ্যমে একক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না। হতে পারে এ গুণের মাঝে অন্যরাও শরীক আছে। অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির সাথে অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর যদি বল, "যায়েদ ব্যতীত আর কেউ দাঁড়ানো নেই" তবে আপনি দণ্ডায়মান হওয়াকে শুধুমাত্র যায়েদের

সাথে সীমিত করে দিলেন। এ বাক্যে আপনি দন্ডায়মানের মাধ্যমে যায়েদকে একক করে দিলেন এবং দাঁড়ানো গুণটিকে যায়েদ ব্যতীত অন্যের জন্য হওয়াকে অস্বীকার করলেন। এভাবেই তাওহীদের প্রকৃত রূপ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ নাফী (না বোধক) ও ইসবাত (হ্যাঁ বোধক) বাক্যের সমন্বয় ব্যতীত তাওহীদ কখনো প্রকৃত তাওহীদ হিসেবে গণ্য হবে না। মুসলিম বিদ্বানগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন:

1) তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ
2) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
3) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কুরআন ও হাদীস গভীরভাবে গবেষণা করে আলিমগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাওহীদ উপরোক্ত তিন প্রকারের মাঝে সীমিত।

প্রথমত: তাওহীদে রুবূবীয়্যার বিস্তারিত পরিচয়

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ।

১- সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব: আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: ٣]

“আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা আছে কী? যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা‘বূদ নেই।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ৩]

কাফিরদের অন্তসার শুন্য মা‘বূদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧﴾ [النحل: ١٧]

“সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৭]

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলার কর্ম এবং মাখলুকাতের কর্ম সবই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহ তা‘আলা মানুষের কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন- একথার ওপর ঈমান আনলেই তাকদীরের ওপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

“আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]

মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কোনো জিনিসের স্রষ্টা উক্ত জিনিসের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]

"আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা।" [সূরা আল-মুমিনূন আয়াত: ১৪]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যা সৃষ্টি করেছিলে, তাতে রূহের সঞ্চার কর"।[1]

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহর মতো করে কোনো মানুষ কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। মানুষের পক্ষে কোনো অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো মৃত প্রাণীকেও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আল্লাহ ছাড়া অন্যের তৈরি করার অর্থ হলো, নিছক পরিবর্তন করা এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করা মাত্র। মূলতঃ তা আল্লাহরই সৃষ্টি। ফটোগ্রাফার যখন কোনো বস্তুর ছবি তুলে, তখন সে সেটাকে সৃষ্টি করে না; বরং বস্তুটিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে মাত্র। যেমন, মানুষ মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে এবং অন্যান্য

[1] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ূ'।

জীব-জন্তু বানায়। সাদা কাগজকে রঙ্গীন কাগজে পরিণত করে। এখানে মূল বস্তু তথা কালি, রং ও সাদা কাগজ সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি। এখানেই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

২- রাজত্বে আল্লাহর একত্ব:

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বলেন,

﴿تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١﴾ [الملك: ١]

"সেই মহান সত্বা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।" [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ﴾ [المؤمنون: ٨٨]

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮৮]

সুতরাং সর্ব সাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যের জন্যেও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন, তিনি বলেন,

﴿أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ﴾ [النور: ٦١]

“অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রনের) মালিক হয়েছো।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾ [المؤمنون: ٦]

“তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের আয়ত্বধীন দাসীগণ ব্যতীত।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৬]

আরো অনেক দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরও রাজত্ব রয়েছে। তবে এ রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের মতো নয়। সেটা অসম্পূর্ণ রাজত্ব। তা ব্যাপক রাজত্ব নয়; বরং তা একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে। তাই উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যায়েদের বাড়ীতে রয়েছে একমাত্র যায়েদেরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তাতে আমরের হস্তক্ষেপ করার কোনো ক্ষমতা নেই এবং বিপরীত পক্ষে আমরের বাড়ীতে যায়েদও কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তারপরও মানুষ আপন মালিকানাধীন বস্তুর ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে থেকে তাঁর আইন-কানুন মেনেই রাজত্ব করে থাকে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অকারণে সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا﴾ [النساء: ٥]

"যে সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ স্বরূপ দান করেছেন, তা তোমরা নির্বোধ লোকদের হাতে তুলে দিও না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫]

মানুষের রাজত্ব ও মুলূকিয়ত খুবই সীমিত। আর আল্লাহর মালিকান ও রাজত্ব সর্বব্যাপী এবং সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। তিনি তাঁর রাজত্বে যা ইচ্ছা, তাই করেন। তাঁর কর্মের কৈফিয়ত তলব করার মতো কেউ নেই। অথচ সকল মানুষ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩- পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

"সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সৃষ্টকুলের রব আল্লাহ তা'আলা অতীব বরকতময়।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহর এ পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোনো শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দিতে পারে না। কোনো কোনো মাখলূকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন, মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে; কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের

সত্যতা প্রমাণিত হলো যে, তাওহীদে রুবূবীয়্যাতের অর্থ সৃষ্টি, রাজত্ব এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ

এককভাবে আল্লাহর ইবাদাত করার নাম তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। মানুষ যেভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে এবং নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, অনুরূপ অন্য কাউকে ইবাদাতের জন্য গ্রহণ না করা। তাওহীদে উলুহীয়্যাতের ভিতরেই ছিল আরবের মুশরিকদের গোমরাহী। এ তাওহীদে উলূহিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সাথে জিহাদ করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জান-মাল, ঘরবাড়ী ও জমি-জায়গা হরণ হালাল মনে করেছিলেন। তাদের নারী-শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছিলেন। এ প্রকার তাওহীদ দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। যদিও তাওহীদে রুবূবিয়্যাত এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাতও নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ছিল; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নবীগণ তাদের স্বজাতীয় লোকদেরকে তাওহীদে উলুহীয়্যার প্রতি আহ্বান জানাতেন। মানুষ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কোনো অংশই পেশ না করে, সদাসর্বদা রাসূলগণ তাদের উম্মতদেরকে এ আদেশই দিতেন। চাই সে হোক নৈকট্যশীল ফিরিশতা, আল্লাহর প্রেরিত নবী, আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ ওলী বা অন্য কোনো মাখলুক। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদে ত্রুটি করবে, সে কাফির মুশরিক। যদিও সে

তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং কোনো মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে শরীক করে, তবে তার এ স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদে রুবূবীয়্যাতে এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে; কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর ইবাদাত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু জবেহ করে তাহলে সে কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২] কুরআনের প্রতিটি পাঠকই একথা অবগত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, তাদের জান-মাল হালাল মনে করেছেন এবং তাদের নারী-শিশুকে বন্দী করেছেন ও তাদের দেশকে গণীমত হিসেবে দখল করেছেন, তারা সবাই একথা স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তারা এতে কোনো সন্দেহ পোষণ করত না; কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও উপাসনা

করত, তাই তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং তাদের জান-মাল হরণ হালাল বিবেচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনো রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তার ওপর ঈমান আনতে হবে- কোনো প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। এ প্রকারের তাওহীদে আহলে কিবলা তথা মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে। এক শ্রেণির লোক আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এর কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণির লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণির লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল

জামা‘আতের কাছাকাছি; কিন্তু সালাফে সালেহীনের[২] মানহাজ[৩] হলো, আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সবগুণে গুণান্বিত করেছেন, সে সব নাম ও গুণাবলীরর ওপর ঈমান আনয়ন করতে হবে।

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত:

১) (الحي القيوم) আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম নাম হচ্ছে, “আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম” এ নামের ওপর ঈমান রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোনো সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোনো দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

২) আল্লাহ নিজেকে السميع (আস-সামীউ‘) শ্রবণকারী নামে অভিহিত করেছেন। তার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। শ্রবণ করা আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলুকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

---

[2] এ কিতাবের যেখানেই “সালাফে সালেহীন” বা শুধু “সালাফ” কথাটি উল্লেখ হবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈগণ।

[3] মানহাজ বলতে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের গৃহীত নির্ভেজাল নীতিকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾ [المائدة: ٦٤]

“ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬৪]

এখানে আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য দু’টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু’টি হাত আছে। এর ওপর ঈমান আনতে হবে; কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣]

“হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন যে, আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) হারাম করেছেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾ [الاسراء: ٣٦]

“যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু’টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী “কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়” একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং আল্লাহর বাণী,

﴿ فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ﴾ [النحل: ٧٤]

“তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না”। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪]- এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোনো কাইফিয়ত[4] তথা ধরণ বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।

আল্লাহর সিফাতের[৫] আরেকটি উদাহরণ পেশ করব –তা হলো আল্লাহ ‘আরশের উপরে উঠা। কুরআনের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ‘আরশের উপরে উঠেছেন। প্রত্যেক স্থানেই ‘ইসতাওয়া’ (استوى) আর প্রত্যেক স্থানেই ‘আলাল আরশি’ (على العرش) “আলাল ‘আরশি” শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। আমরা যদি আরবী ভাষায় ইসতিওয়া শব্দটি অনুসন্ধান করতে যাই তবে দেখতে পাই যে, (استوى) শব্দটি যখনই (**على**) অব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবহার হয়েছে তখনই তার অর্থ হয়েছে ‘(الارتفاع) বা (العلو) অর্থাৎ ‘উপরে উঠা’। এটা ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে তখন তার ব্যবহার হয় না। সুতরাং **الرَّحْمَنُ على العَرْشِ استوى** এবং এর মতো অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তিনি তাঁর আরশের উপর রয়েছেন বিশেষ একপ্রকার উপরে

---

[4] আল্লাহর গুনাবলীর বিশেষ কোনো ধরণ, গঠণ বা পদ্ধতি বর্ণনা করাকে “তাকয়ীফ” বা “কাইফিয়াত” বলা হয়। যেমন, কেউ বলল ‘আল্লাহর হাত এরকম এ রকম’এভাবে আল্লাহর সিফাতসমূহের কাইফিয়াত (ধরণ-গঠন) বর্ণনা করা হারাম।

[5] আল্লাহর গুণাবলী এবং আল্লাহর কর্মসমূহকে আল্লাহর সিফাত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

থাকা, যা তার সৃষ্টি জগতের উপরে সাধারণভাবে উপরে থাকার চেয়ে ভিন্নতর। আর এ উপরে থাকার বিষয়টি হান আল্লাহর জন্য প্রকৃত অর্থেই সাব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার জন্য যেমনভাবে উপযুক্ত, সেভাবেই তিনি 'আরশের উপরে উঠেছেন। আল্লাহর 'আরশের উপরে হওয়া এবং মানুষের খাট-পালং ও নৌকায় আরোহনের সাথে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই। যে আরোহনের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلۡفُلۡكِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مَا تَرۡكَبُونَ ١٢ لِتَسۡتَوُۥاْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ رَبِّكُمۡ إِذَا ٱسۡتَوَيۡتُمۡ عَلَيۡهِ وَتَقُولُواْ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقۡرِنِينَ ١٣ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١٤﴾ [الزخرف: ١٢، ١٤]

"তিনি তোমাদের আরোহনের জন্য সৃষ্টি করেন নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু; যাতে তোমরা তার উপর আরোহণ করতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের জন্য বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ১২-১৪]

সুতরাং মানুষের কোনো জিনিসের উপরে উঠা কোনো ক্রমেই আল্লাহর 'আরশের উপরে হওয়ার সদৃশ হতে পারে না। কেননা আল্লাহর মতো কোনো কিছু নেই।

যে ব্যক্তি বলে যে, 'আরশের উপরে আল্লাহর উঠার অর্থ 'আরশের অধিকারী হয়ে যাওয়া, সে প্রকাশ্য ভুলের মাঝে রয়েছে। কেননা এটা আল্লাহর কালামকে আপন স্থান থেকে পরির্বতন করার শামিল এবং সাহাবী এবং তাবে'ঈদের ইজমার সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরণের কথা এমন কিছু বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে, যা কোনো মুমিনের মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়া সংগত নয়। কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٣﴾ [الزخرف: ٣]

"নিশ্চয় আমরা এ কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩] আরবী ভাষায় ইসতাওয়া শব্দের অর্থ 'উপরে ওঠা' এবং 'বিরাজমান থাকা'। আর এটাই হলো ইসতিওয়া শব্দের আসল অর্থ। সুতরাং 'তিনি আরশের উপরে উঠেছেন' এর অর্থ, তিনি আরশের উপর উঠেছেন, বিশেষ প্রকার উপরে উঠা, আল্লাহর বড়ত্বের শানে 'আরশের উপর যেভাবে উপরে উঠা' প্রযোজ্য, সেভাবেই তিনি উপরে উঠেছেন। যদি ইসতিওয়ার (উপরে উঠার) অর্থ ইসতাওলা (অধিকারী) হওয়ার মাধ্যমে করা হয়, তবে তা হবে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার শামিল। আর যে ব্যক্তি এরূপ করল, সে কুরআনের ভাষা যে অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে (তা হচ্ছে, উপরে উঠা), তা অস্বীকার করল এবং অন্য একটি বাতিল অর্থ সাব্যস্ত করল।

তাছাড়া “ইসতিওয়া” এর যে অর্থ আমরা বর্ণনা করলাম, তার ওপর সালাফে সালেহীন ঐকমত্য (ইজমা) পোষণ করেছেন। কারণ, উক্ত অর্থের বিপরীত অর্থ তাদের থেকে বর্ণিত হয় নি। কুরআন এবং সুন্নাতে যদি এমন কোনো শব্দ আসে সালাফে সালেহীন থেকে যার প্রকাশ্য অর্থ বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা না পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো উক্ত শব্দকে তার প্রকাশ্য অর্থের ওপর অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং তার মর্মার্থের উপর ঈমান রাখতে হবে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সালাফে সালেহীন থেকে কি এমন কোনো কথা বর্ণিত হয়েছে যা প্রমাণ করে যে, “ইসতাওয়া” অর্থ “আলা” (‘আরশের উপরে উঠেছেন)? উত্তরে আমরা বলব হ্যাঁ, অবশ্যই তা বর্ণিত হয়েছে। যদি একথা ধরে নেওয়া হয় যে, তাদের থেকে এ তাফসীর স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নি, তাহলেও এ সব ক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনের মানহাজ (নীতি) হলো, কুরআন এবং সুন্নাহর শব্দ যে অর্থ নির্দেশ করবে, আরবী ভাষার দাবী অনুযায়ী শব্দের সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

‘ইসতিওয়া’র অর্থ ইসতাওলা দ্বারা করা হলে যে সব সমস্যা দেখা দেয়

১) ‘ইসতাওলা’ অর্থ কোনো বস্তুর মালিকানা হাসিল করা বা কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাই ‘ইসতিওয়া’র অর্থ ইসতাওলার মাধ্যমে করা হলে অর্থ দাঁড়ায়, আকাশ-জমিন সৃষ্টির আগে আল্লাহ ‘আরশের মালিক ছিলেন না, পরে মালিক হয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الاعراف: ٥٣]

“নিশ্চয় তোমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ‘আরশের উপরে ‘ইস্তেওয়া’ করলেন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] তখন তাদের কথা অনুসারে অর্থ দাঁড়াবে, আসমান সৃষ্টির পূর্বে এবং আসমান যমীন সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি আরশের অধিকারী ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

২) “আর-রাহমানু আলাল ‘আরশিস তাওয়া” অর্থ যদি ‘ইস্তাওলা’র মাধ্যমে করা শুদ্ধ হয় তাহলে এ কথা বলাও শুদ্ধ হতে হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যমীনের কর্তৃত্ববান হলেন, তিনি তার সৃষ্টিকুলের যে কোনো কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল হলেন। অথচ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটা একটি বাতিল অর্থ। এ ধরণের অর্থ মহান আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়।[6]

---

[১] আল্লাহ তা‘আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর তিনি একমাত্র মালিক। সূচনা থেকেই সকল বস্তুর ওপর তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়ে গেলেন। এ ধরণের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

৩) এটি আল্লাহর কালামকে তার আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়ার শামিল।

৪) এ ধরণের অর্থ করা সালাফে সালেহীনের ইজমার পরিপন্থী।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে সারকথা এই যে, আল্লাহ নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোনো পরিবর্তন, বাতিল বা ধরণ-গঠন কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই তার প্রকৃত অর্থের ওপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।

মক্কার কাফিরদের শির্ক কোন ধরণের ছিল?

প্রশ্ন: (২) যাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের শির্ক কী ধরণের ছিল?

উত্তর: যাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তারা তাওহীদে রুবূবিয়্যাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করত না। কুরআনে কারীমের ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, তারা কেবল তাওহীদে উলুহিয়্যাতে আল্লাহর সাথে শির্ক করত।

রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহই একমাত্র রব আর তিনিই বিপদগ্রস্তের আহ্বানে সাড়াদানকারী, আর তিনিই বিপদাপদ দূরকারী; ইত্যাদি যে সব বিষয় আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে জানিয়েছেন যে, তারা সেগুলোর রুবুবিয়্যাত কেবল আল্লাহর জন্য স্বীকৃতি দিত।

কিন্তু তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করত, আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদতও করত। এ ধরণের শির্ক মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। কেননা তাওহীদের শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো কিছু একক করে নির্দিষ্ট করা। আর আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নির্দিষ্ট হক রয়েছে, যা এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব। এ হকগুলো তিন প্রকার:

1) মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকার

2) ইবাদাত পাওয়ার অধিকার
3) নাম ও গুণাবলীর অধিকার

এজন্যই আলেমগণ তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত এবং তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ।

আরবের মুশরিকরা কেবল ইবাদত অংশেই আল্লাহর সাথে শরীক করত, তারা আল্লাহর সাথে অন্যেরও ইবাদত করত। আর এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ [النساء: ٣٦]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬] অর্থাৎ তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

“এবং তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদাত করতে অহংকার করবে, তারা অচিরেই অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তা‘আলা ইখলাস বা নিষ্ঠার সূরায় বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥﴾ [الكافرون: ١، ٥]

“বলুন, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর, এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করে আসছো।” [সূরা কাফিরূন, আয়াত: ১-৫]

লক্ষ্য করুন, এখানে আমি সূরা আল-কাফিরূনকে সূরা ইখলাস নাম দিয়েছি। কারণ এ সূরা আমল বা কর্মে ইখলাস শিক্ষা দেয়। যদিও সূরাটির নাম সূরা আল-কাফিরূন। কিন্তু এ সূরাটি আমলি ইখলাসের সূরা, যেমনটি সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ইলমি বা আকীদা বিষয়ক ইখলাসের সূরা।

আল্লাহই হচ্ছেন সত্যিকারের তাওফীকদাতা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি কী?

প্রশ্ন: (৩) আকীদা ও অন্যান্য দীনি বিষয়ের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতিগুলো কী কী?

উত্তর: আকীদা ও দীনের অন্যান্য বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মূলনীতি হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও সুন্নাতকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [ال عمران: ٣١]

“হে নবী! আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠﴾ [النساء: ٨٠]

“যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করল সে স্বয়ং আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিবে, আমি তাদের জন্য আপনাকে সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করি নি।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

“এবং আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা তোমরা গ্রহণ কর আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭] যদিও আয়াতটি গণীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তবে শরী‘আতের অন্যান্য মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উত্তমভাবে প্রযোজ্য হবে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর সালাতের খুৎবায় বলতেন,

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وكل ضلالة فى النار»

“অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে দীনের ভিতরে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা। প্রতিটি বিদ‘আতই গোমরাহী। আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।”[7]

অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[7] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাতুল জুমু‘আ

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হিদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতের অনুসরণ করবে এবং সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা দীনের বিষয়ে নতুন আবিস্কৃত বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কারণ, প্রতিটি নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ'আত আর প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।"[৪] এ সম্পর্কে আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ হলো, আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের পথকে আকঁড়ে ধরা। তাছাড়া তাদের পথের অন্যতম দিক হলো, তারা সদাসর্বদা দীন কায়েমের প্রচেষ্টা করেন, এর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করেন না। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশনা পালন করে থাকেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورا: ١٣]

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা

[৪] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ।

দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে বিভেদ সৃষ্টি করো না।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩] আর তাদের মাঝে কখনো মতবিরোধ হয়ে থাকলে তা হয়েছে কেবল এমন ক্ষেত্রে, যাতে ইজতেহাদ[9] করা বৈধ আছে। এ ধরণের মতবিরোধ অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে না। ইজতেহাদী বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ হওয়া সত্বেও আপনি তাদের মাঝে একতা এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন: (৪) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত কারা?

উত্তর: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তারাই, যারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে এবং তার ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেয় না। এ কারণেই তাদেরকে আহলে সুন্নাত রূপে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তারা সুন্নাহর ধারক ও বাহক। তাদেরকে আহলে জামা‘আতও বলা হয়। কারণ, তাঁরা সুন্নাহর উপর জামাতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ।

অপরদিকে আপনি যদি বিদ‘আতীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের এ অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যে, তারা যে পরিমাণ বিদ‘আত তৈরি করেছে সে পরিমাণ সুন্নাত থেকে দূরে সরে গেছে।

জান্নাতী দলের পরিচয়:

---

[9] কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতেহাদ বলে। আর যে আলেম ইজতেহাদ করার যোগ্য, তাঁকে মুজতাহেদ বলা হয়।

প্রশ্ন: (৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর উম্মত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। সম্মানিত শাইখের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসের[10] মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াহূদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে, নাসারারা বিভক্ত হয়েছে ৭২ দলে, আর এ উম্মাতে মুহাম্মাদী বিভক্ত হবে ৭৩ দলে। একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি হলো সেই দল, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ দলটি দুনিয়াতে বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এটিই হলো সাহায্যপ্রাপ্ত দল, যা কিয়ামত পর্যন্ত হকের ওপর বিজয়ী থাকবে।

এ তিয়াত্তর ফের্কার মধ্যে কবেল একটিই হকের ওপর রয়েছে, বাকীরা সবাই বাতিল পথে রয়েছে। কোনো কোনো আলিম এ জাহান্নামী ৭২ ফিরকার পরিচয় নির্ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথমত: বিদ‘আতীদেরকে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক ভাগ থেকে শাখা-প্রশাখা বের করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষিত ৭২ টি ফিরকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিছু কিছু আলিম

[10] আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান।

ফিরকাগুলো নির্ধারণ না করাই উত্তম মনে করেছেন। কারণ, যারা গণনা করেছেন তাদের গণনাকৃত ফিরকার বাইরেও বহু ফিরকা রয়েছে যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হওয়া লোকদের থেকেও বেশি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। আর এ বাহাত্তর ফিরকা গণনার পরেও অনেক ফিরকার উৎপত্তি হয়েছে। তারা আরও বলেন, এ সংখ্যা শেষ হবার নয়। বরং শেষ যামানায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এর সর্বশেষ সংখ্যা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং উত্তম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্তভাবেই রাখা। আমরা এভাবে বলব যে, এ উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। ৭২ দল জাহান্নামে যাবে এবং মাত্র একদল জান্নাতে যাবে। অতঃপর বলব, যে দলটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহর বিরোধিতা করবে, সে এ ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদসংক্রান্ত এমন কিছু মূলনীতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তন্মধ্যে আমরা কেবল দশটিই জানি। আবার হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যার সাথে বহু শাখা-প্রশাখা জড়িত; যা কারও কারও মত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন: (৬) নাজাত প্রাপ্ত দলের বৈশিষ্ট্য কী? কোনো ব্যক্তির মাঝে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কোনো একটি অবর্তমান থাকলে সে ব্যক্তি কি নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাবে?

উত্তর: নাজাতপ্রাপ্ত দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, আকীদা, ইবাদাত, চরিত্র ও আচার ব্যবহারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরা।

আপনি দেখতে পাবেন যে, আকীদার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসারী। উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত এবং আসমা ওয়াস সিফাতের[১১] ক্ষেত্রে তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন।

ইবাদাতের ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকারী। ইবাদাতের প্রকার, পদ্ধতি, পরিমাণ, সময়, স্থান এবং ইবাদাতের কারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণ করাই তাদের বৈশিষ্ট্য। আপনি তাদের নিকট দীনের ব্যাপারে কোনো বিদ‘আত খুঁজে পাবেন না। তারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করে চলেন। আল্লাহ অনুমতি দেন নি, ইবাদাতের ক্ষেত্রে এমন বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তারা আল্লাহ এবং রাসূলের অগ্রণী হয় না।

---

[11] সকল প্রকার ইবাদাত এককভাবে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করাকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বলা হয়। আল্লাহর সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদুর রুবুবীয়্যাহ। আর কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস করাকে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলা হয়।

আখলাক-চরিত্রের ক্ষেত্রেও আপনি তাদেরকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখতে পাবেন। মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা, অপরের জন্য উদার মনের পরিচয় দেওয়া, মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, উত্তম কথা বলা, বদান্যতা, বীরত্ব এবং অন্যান্য মহান গুণাবলী তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুনিয়াবী লেনদেনের বিষয়াদিতে আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন যে, তারা সততার সাথে সকল প্রকার লেন-দেন সম্পন্ন করে থাকেন। কাউকে ধোকা দেন না। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তারা দ্রব্যের আসল অবস্থা বর্ণনা করে দেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

“পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার অধিকার রয়েছে। যদি তারা উভয়েই সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে, আল্লাহ তাদের বেচা-কেনায় বরকত দান করেন। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতর থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়”।[12]

---

[12] সহীহ বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ূ‘ (ক্রয়-বিক্রয়)।

উপরে যে সমস্ত গুণাবলীর আলোচনা করা হলো, কোনো ব্যক্তির মাঝে উক্ত গুণাবলীর কোনো বৈশিষ্ট্য অবর্তমান থাকলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই আপন আপন আমল অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করবে। তবে তাওহীদের ক্ষেত্রে ত্রুটি করলে নাজাত প্রাপ্ত দল হতে বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ‘আতের বিষয়টিও অনুরূপ। কিছু কিছু বিদ‘আত এমন আছে, যা মানুষকে নাজাতপ্রাপ্ত দল থেকে বের করে দেয়। তবে চরিত্র ও লেন-দেনের ভিতরে কেউ ত্রুটি করলে সে নাজাত প্রাপ্ত দল থেকে বের হবে না, বরং মর্যাদা কমিয়ে দিবে।

সম্ভবত আখলাকের বিষয়টি একটু দীর্ঘ করে বর্ণনা করা দরকার। চরিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরস্পরে একতাবদ্ধ থাকা যায় এবং আল্লাহ তা‘আলা যে হকের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়েছেন, তার ওপর অটুট থাকা বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: ١٣]

“তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দীনকে, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে। আর যা আমরা অহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১৩] আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে,

যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ﴾ [الانعام: ١٥٩]

“নিশ্চয় যারা দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে আপনি কোনো ব্যাপারেই তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৯]

সুতরাং ঐক্যবদ্ধ থাকা নাজী ফিরকার (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের মাঝে কোনো ইজতেহাদী বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাদের এ মতবিরোধ পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার সৃষ্টি করে না; বরং তারা বিশ্বাস করে যে, তারা পরস্পরে ভাই। যদিও তাদের মাঝে এ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি তাদের একজন এমন ইমামের পিছনেও সালাত আদায় করে থাকে, তার দৃষ্টিতে সেই ইমাম অযু বিহীন। আর ইমাম বিশ্বাস করে যে, সে অযু অবস্থায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা উটের গোশত খেয়ে অযু করে নি এমন ইমামের পিছনেও সালাত আদায় করে থাকে। ইমাম মনে করে যে, উটের গোশত খেলে অযু ভঙ্গ হয় না। আর মুক্তাদী মনে করে যে, অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। তা সত্বেও সে মনে করে উক্ত ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা জায়েয আছে। এমনটি তারা এ জন্যই করে যে, যেখানে ইজতেহাদের সুযোগ রয়েছে সেখানে ইজতেহাদের কারণে যে সকল মতভেদ সৃষ্টি হয়,

তা প্রকৃতপক্ষে মতভেদ নয়। কেননা প্রত্যেকেই আপন আপন দলীলের অনুসরণ করে থাকে, যে সব দলীলের অনুসরণ করা তিনি আবশ্যক মনে করে থাকেন এবং যে দলীল থেকে বিমুখ হওয়া তিনি জায়েয মনে করেন না। তারা মনে করেন তাদের কোনো দীনি ভাই দলীলের অনুসরণ করতে গিয়ে যদি কোনো আমলে তাদের বিরোধিতা করেন প্রকৃতপক্ষে তারা বিরোধিতা করেন নি; বরং তাদের অনুরূপই করেছেন। কারণ, তারাও দলীলের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান জানান। যেখানেই তা পাওয়া যাক না কেন। সুতরাং তিনি যদি তার কাছে থাকা কোনো দলীল অনুযায়ী আমল করার কারণে তাদের বিরোধিতাও করেন তবুন তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে একাত্মতাই পোষণ করলেন। কেননা তিনি তো সে পথেই চললেন যে পথের দিকে তারা আহ্বান করে এবং পথনির্দেশ করে, আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করা।

অধিকাংশ আলিমের কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবীগণের ভিতরে এরকম অনেক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি কাউকে ধমক দেন নি বা কারও ওপর কঠোরতা আরোপ করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খন্দকের যুদ্ধ হতে ফেরত আসলেন, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বানু কুরায়যায় অভিযান পরিচালনার প্রতি ইঙ্গিত করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে

বললেন, তোমাদের কেউ যেন বানু কুরায়যায় না গিয়ে আসরের সালাত না পড়ে।[13] সাহাবীগণ এ কথা শুনে মদীনা হতে বের হয়ে বানু কুরায়যার দিকে রওনা দিলেন। পথিমধ্যে আসরের সালাতের সময় হয়ে গেল। তাদের কেউ সালাত না পড়েই বানু কুরায়যায় পৌঁছে গেলেন। এদিকে সালাতের সময় শেষ হয়ে গেল। তারা বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসরের সালাত অবশ্যই বানী কুরায়যায় গিয়ে পড়তে হবে। তাদের কেউ সালাত ঠিক সময়েই পড়ে নিল। তাদের কথা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বের হতে বলেছেন। তাঁর কথার অর্থ এটা নয় যে, আমরা সময় মত সালাত না পড়ে পিছিয়ে নিব। এরাই সঠিক ছিল। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দলের কাউকে ধমক দেন নি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য বুঝার ক্ষেত্রে ভিন্নমত হওয়া সত্বেও তাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় নি।

এ হাদীসটি বুঝতে গিয়ে যে মতভেদের সূচনা হয়েছিল, তার কারণে তাদের মধ্যে শত্রুতা বা দলাদলির সৃষ্টি হয় নি। আর সেজন্য আমি মনে করি দলীলের ভিত্তিতে ইজতেহাদী কোনো মাসআলায় মতভেদ হওয়া সত্বেও, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিৎ। তাদের মধ্যে দলাদলি থাকবে না। এমন হবে না যে তাদের একদল অমুকের দিকে সম্পর্কযুক্ত, দ্বিতীয়দল অন্যের দিকে সম্পর্কযুক্ত হবে আর তৃতীয়দল অন্যের দিকে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করবে, পরস্পর

---

[13] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল খাওফ।

হানাহানিতে, বাকযুদ্ধে লিপ্ত হবে, পরস্পর শত্রুতা পোষণ করবে, হিংসা-বিদ্বেষ করবে এমনসব বিষয়ে যেখানে ইজতিহাদ করা গ্রহণযোগ্য। এখানে আমি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিশেষ করে নাম ধরে বলার দরকার মনে করছি না, কিন্তু বিবেকবান মাত্রই সহজে বুঝতে পারবে এবং তার তার জন্য তা স্পষ্ট হবে।

সুতরাং আমার মত হচ্ছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ওপর কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ থাকা, এমনকি যদিও কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য বুঝার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েও যায়। কারণ আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এটি এমন এক বিষয়, যাতে ব্যাপক উদারতা রয়েছে।

সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা চায় যে, মুসলিমগণ পরস্পরে বিভক্ত হোক। তাদের কারও শত্রুতা প্রকাশিত, আবার তাদের কেউ কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে, অথচ তারা প্রকৃতই শত্রু। সুতরাং আমাদের ওপর কতর্ব্য হবে 'নাজী ফির্কা' তথা নাজাতপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে হকের ওপর ঐক্যবদ্ধ থাকা।

প্রশ্ন: (৭) দীনের ভিতরে 'মধ্যমপন্থা' বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: দীনের ভিতরে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, মানুষ দীনের মধ্যে কোনো কিছু বাড়াবে না; যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এমনিভাবে দীনের কোনো অংশ কমাবে না;

যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত দীনের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে দেয়।

দীনের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী অনুসরণ করা। তাঁর জীবনাদর্শ অতিক্রম করা দীনের ভিতরে অতিরঞ্জনের শামিল। তাঁর জীবন চরিতের পূর্ণ অনুসরণ না করা তাতে কমতি করার শামিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একলোক বলল আমি আজীবন রাত্রি জেগে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ব। রাত্রিতে কখনই নিদ্রা যাব না। কারণ, সালাত অন্যতম উত্তম ইবাদাত। তাই সালাতের মাধ্যমে বাকী জীবনের রাত্রিগুলো জাগরণ করতে চাই। আমরা তার উত্তরে বলব যে, এ ব্যক্তি দীনের মাঝে অতিরঞ্জনকারী। সে হকের উপর নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এরকম হয়েছিল। তিনজন লোক একত্রিত হয়ে একজন বলল, আমি সারা রাত্রি সালাত আদায় করবো, ঘুমাবো না। অন্যজন বলল আমি সারা বছর সাওম রাখবো এবং কখনো তা ছাড়ব না। তৃতীয়জন বলল আমি বিয়েই করবো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন “একদল লোকের কি হলো তারা এ রকম কথা বলে থাকে? অথচ আমি সাওম রাখি এবং কখনো সাওম থেকে বিরত থাকি। রাত্রির কিয়াম করি ও ঘুমাই। স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। এটি আমার সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ থাকবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।” এ লোকেরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নতার কথা ঘোষণা করলেন। কেননা

তারা সাওম রাখা না রাখা, রাত্রি জাগরণ করা, ঘুমানো এবং বিয়ে করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিল।

আর দীনী বিষয়ে কমতিকারী, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে বলে, আমার নফল ইবাদাতের দরকার নেই। শুধু ফরয ইবাদতগুলোই পালন করব। কখনও কখনও সে ব্যক্তি ফরয আমলেও ত্রুটি করে থাকে। সে অবশ্যই ত্রুটিকারী।

আর মধ্যম পথের অনুসারী হলো সেই ব্যক্তি, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহর উপর চলবে।

অন্য একটি দৃষ্টান্ত হলো, মনে করুন তিনজন ভালো লোকের পাশে রয়েছে একজন ফাসিক ব্যক্তি। তিনজনের একজন বলল, আমি এ ফাসিককে সালাম দিব না। তার থেকে দূরে থাকব এবং তার সাথে কথা বলব না।

অপর জন বলল, আমি এর সাথে চলব, তাকে সালাম দিব, হাসি মুখে তার সাথে কথা বলব, তাকে দাওয়াত দিব এবং তার দাওয়াতে আমিও শরীক হব। আমার নিকট সে অন্যান্য সৎ লোকের মতই।

তৃতীয়জন বলল, আমি এ ফাসিক ব্যক্তিকে তার পাপাচারিতার কারণে ঘৃণা করি। তার ভিতরে ঈমান থাকার কারণে আমি তাকে ভালোবাসি। তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করব না। তবে তাকে সংশোধনের কারণে বর্জন করা হলে তা ভিন্ন কথা। তাকে বর্জন করলে যদি তার পাপাচারিতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে আমি তাকে বর্জন করব না। এ

তিনজনের প্রথম ব্যক্তি বেশি বাড়াবাড়ি করল। দ্বিতীয়জন ত্রুটি করল এবং তৃতীয়জন মধ্যম পন্থা ও সঠিক পথের অনুসরণ করল।

অন্যান্য সকল ইবাদাত ও মানুষের মু'আমালাতের[14] ক্ষেত্রেও অনুরূপটি ঘটে থাকে। মানুষ এতে ত্রুটিকারী, বাড়াবাড়িকারী ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী হয়ে থাকে।

তৃতীয় আরেকটি উদাহরণ, মনে করুন একজন লোক তার স্ত্রীর কথায় চলে। তার স্ত্রী তাকে যেখানে পাঠায় সেখানে যায়। সে তার স্ত্রীকে অন্যায় কাজ হতে বাধা প্রদান করে না এবং স্ত্রীকে কোনো ভালো কাজে উৎসাহ দেয় না। সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী তার উপর কর্তৃত্ব করছে এবং তার মালিক হয়ে বসেছে।

আরেক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কোনো ব্যাপারেই গুরুত্ব দেয়না। তার স্ত্রীর সাথে অহংকার করে চলে। যেন তার স্ত্রী তার কাছে চাকরানীর চেয়ে অবহেলিত।

---

[14] মানুষ পরস্পরে যে লেন-দেন, বেচা-কেনা, চুক্তি, ওয়াদা-অঙ্গীকার ও পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করে থাকে, তাকে ইসলামের পরিভাষায় মু'আমালাত বলা হয়। এসবের সাথে ইবাদতের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এগুলো যদি ইসলামী নীতিমালার ভিতরে হয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, তবে তাও ইবাদাতে পরিণত হয়।

অন্য ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ব সীমা অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে আচরণ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: ٢٢٨]

“তাদের (স্ত্রীদের) জন্য তোমাদের ওপর হক রয়েছে, যেমন তাদের ওপর তোমাদের হক রয়েছে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮] কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। স্ত্রীর কোনো একটি চরিত্রকে অপছন্দ করলে হয়ত অন্য একটি গুণ দেখে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।[15] শেষ ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী, প্রথম ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় শিথিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ত্রুটিকারী (অবহেলাকারী ও অবজ্ঞাকারী)। হে প্রিয় পাঠক! আপনি সকল ইবাদাত ও আচার-আচরণকে উক্ত উদাহরণগুলোর উপরে অনুমান করুন।

প্রশ্ন: (৮) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট ঈমান অর্থ কী? ঈমান কি বাড়ে এবং কমে?

উত্তর: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মতে ঈমান হচ্ছে, অন্তরের স্বীকৃতি, মৌখিক উচ্চারণ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মে আনয়ন। সুতরাং ঈমান তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে,

---

[15] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুর রাদা।

১- অন্তরের স্বীকৃতি,

২- মৌখিক উচ্চারণ এবং

৩- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

যেহেতু উক্ত বিষয়সমূহের সমষ্টির নাম ঈমান, সে হিসাবে তা বাড়বে এবং কমবে এটিই স্বাভাবিক। কারণ, অন্তরের স্বীকৃতির তারতম্য হয়ে থাকে। অতএব, সংবাদ শুনে কোনো কিছু স্বীকার করা আর আপন চোখে দেখে স্বীকার করা এক কথা নয়। অনুরূপভাবে একজনের দেওয়া সংবাদ স্বীকার করা আর দু'জনের সংবাদ স্বীকার করে নেওয়া এক কথা নয়। এ জন্যই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

﴿رَبِّ أَرِنِي كَيۡفَ تُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ قَالَ أَوَ لَمۡ تُؤۡمِنۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطۡمَئِنَّ قَلۡبِيۖ﴾ [البقرة: ٢٦٠]

"হে আমার রব! আমাকে দেখান আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি ঈমান আন নি? ইবরাহীম বললেন, ঈমান তো অবশ্যই এনেছি, কিন্তু আমার অন্তর যাতে পরিতৃপ্ত হয় এজন্য আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬০]

কাজেই অন্তরের স্বীকৃতি এবং তার স্থীরতা ও প্রশান্তির দিক থেকে ঈমান বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার অন্তরে তা সহজেই অনুভব করে থাকে। সে যখন ইসলামী অনুষ্ঠান বা ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হয়ে নসীহত শুনে বা জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনে, তখন তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন কি সে যেন জান্নাত- জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে।

অতঃপর যখন গাফিলতি চলে আসে এবং যখন মজলিস থেকে উঠে যায়, তখন তার অন্তরে সে দৃঢ়বিশ্বাস হালকা হয়ে যায়।

এমনিভাবে মুখের আমলের (যিকির) কারণেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। কেননা যে ব্যক্তি দশবার আল্লাহর যিকির করল, সে একশতবার যিকিরকারীর সমান নয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির আমল প্রথম ব্যক্তির আমলের চেয়ে অনেক বেশি। বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ইবাদাত সম্পন্ন করবে আর যে ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করবে- উভয়ে সমান নয়।

এমনিভাবে আমলের মাধ্যমেও ঈমান বাড়ে। যে ব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বেশি আমল করে তার ঈমান কম আমলকারীর চেয়ে বেশি। বেশি-কম হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةٗۙ وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ إِلَّا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسۡتَيۡقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗا﴾ [المدثر: ٣١]

“আমরা জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ফিরিশতাগণকেই রেখেছি। আমরা কাফিরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তাদের এ সংখ্যা নির্ধারণ করেছি, যাতে কিতাবধারীরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।” [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ١٢٤ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ١٢٥﴾ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥]

“আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল? তবে যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের অন্তরে কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফির অবস্থায়ই মৃত্যু করল।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৪-২৫]

সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে,

«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»

“দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ হওয়া সত্বেও জ্ঞানী পুরুষদের জ্ঞানকে তোমাদের চেয়ে অধিক হরণকারী আর কাউকে দেখি নি।”[16] সুতরাং ঈমান বাড়ে এবং কমে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঈমান বাড়ার কারণ কী?

ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার উপায়সমূহ

প্রথম উপায়: আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলীসহ আল্লাহ তা‘আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে, নিঃসন্দেহে তার

---

[16] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হাঈদ।

ঈমানও তত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্যই যে সমস্ত আলিম আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা এ সম্পর্কে জ্ঞানহীন আলিমদের চেয়ে ঈমানের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয় উপায়: সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং আল্লাহ মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তার ভিতরে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে যতই চিন্তা করবে, ততই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَفِي ٱلۡأَرۡضِ ءَايَٰتٞ لِّلۡمُوقِنِينَ ٢٠ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١ ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١]

"দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?" [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ২০-২১] আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করলে যে ঈমান বৃদ্ধি পায়, এ মর্মে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয় উপায়: বেশি বেশি সৎ কাজ সম্পাদন করা। সৎ আমল যতই বৃদ্ধি পাবে, ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে। এ সৎ আমল মুখের কথার মাধ্যমে হোক, কিংবা কাজের মাধ্যমে হোক যেমন যিকর আযকার, সালাত, সাওম এবং হজ্জ। এসব কিছুই ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম।

ঈমান কমে যাওয়ার কারণসমূহ

প্রথম কারণ: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা ঈমান কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই কমবে, ঈমানও তত কমতে থাকবে।

দ্বিতীয় কারণ: সৃষ্টিতে ও শরী'আতে আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহর সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনা না করা ঈমানের ঘাটতি হওয়ার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় কারণ: গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। কেননা গুনাহের কাজ করলে অন্তরে এবং ঈমানের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

“ব্যভিচারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে না।”[17]

চতুর্থ কারণ: সৎ আমল না করা ঈমান হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু যদি বিনা কারণে কোনো ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে ঈমান কমার সাথে সাথে সে তিরস্কার ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। অবশ্য গ্রহণযোগ্য কারণে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে অথবা ওয়াজিব নয় এমন কাজ ছেড়ে দিলে ঈমানের ঘাটতি হবে, কিন্তু তিরস্কারের সম্মুখীন হবে না। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে জ্ঞান ও দীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণ বলেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন

---

[17] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হুদূদ; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

যে, তাদের যখন মাসিকের রক্ত বের হয়, তখন তারা সালাত-সাওম থেকে বিরত থাকে। অথচ মাসিক অবস্থায় সালাত-সাওম থেকে বিরত থাকার কারণে তাদেরকে দোষারোপ করা হয় না; বরং তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যেহেতু পুরুষদের তুলনায় তাদের আমল কম হয়ে গেল, সে হিসেবে তারা পুরুষের চেয়ে কম ঈমানের অধিকারী।

হাদীসে জিবরীল এবং আবদুল কায়েসের হাদীসের মধ্যে সমন্বয়:

প্রশ্ন: (৯) হাদীসে জিবরীলে ঈমানের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমান হলো 'আল্লাহর উপর ঈমান রাখা, তাঁর ফিরিশতা, আসমানী কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস রাখার নাম'।[18] অথচ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈমান হলো 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয়, একথার সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা।' উপরের উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কীভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি বলতে চাই যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ভিতরে কোনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নেই। কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের বিরোধী নয়। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ক্ষেত্রেও একই কথা। কুরআন ও সুন্নাতে পরস্পর বিরোধী কোনো জিনিস নেই। এ মূলনীতিটি মনে রাখলে কুরআন-হাদীস বুঝার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[18] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ۝٨٢﴾ [النساء: ٨٢]

"তারা কি কুরআন গবেষণা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে হত, তাহলে তারা উহাতে অনেক মতভেদ দেখতে পেত।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮২]

কুরআনের ভিতরে যেহেতু মতবিরোধ নেই, রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের ক্ষেত্রেও তাই। এক হাদীস অন্য হাদীসের বিরোধী নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এক স্থানে ঈমানকে একভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং অন্য স্থানে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন, যা আপনার দৃষ্টিতে প্রথম ব্যাখ্যার বিরোধী মনে হয়, কিন্তু আপনি যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে আপনি কোনো দ্বন্দ্ব পাবেন না।

হাদীসে জিবরীলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান এ তিনভাগে ভাগ করেছেন। আর আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের হাদীসে শুধুমাত্র দীনের একটি মাত্র প্রকার তথা ইসলামের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে শুধুমাত্র ইসলামের কথা উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারণ, মুমিন হওয়া ব্যতীত ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। আবার যেখানে শুধুমাত্র ঈমানের আলোচনা হবে, সেখানে ইসলামও অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, প্রত্যেক মুমিনকে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। আর যেখানে ঈমান ও ইসলাম একই সাথে উল্লেখ হবে, সেখানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অন্তরের বিষয়সমূহ। আর ইসলাম দ্বারা উদ্দেশ্য

হবে বাহ্যিক আমলসমূহ। ইলম অর্জনকারীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। শুধুমাত্র ইসলামের আলোচনা আসলে ঈমানও তার ভিতরে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

"ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

আর এটা জানা বিষয় যে, ইসলাম আকীদা, ঈমান ও বাহ্যিক আমলের সমষ্টি। এককভাবে ঈমানের উল্লেখ হলে ইসলামকে তার ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দু'টি একসাথে উল্লেখ হলে ঈমানের অর্থ হবে অন্তরে বিশ্বাস করার বিষয়সমূহ আর ইসলামের অর্থ হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমলসমূহ। এ জন্যই পূর্ববর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম বলেছেন, ইসলাম প্রকাশ্য বিষয় এবং ঈমান গোপনীয় বিষয়। কারণ, তা অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আপনি কখনো দেখতে পাবেন যে, মুনাফিক ব্যক্তি সালাত পড়ছে, সাওম রাখছে এবং সাদকা করছে। এ ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে মুসলিম কিন্তু মুমিন নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨﴾ [البقرة: ٨]

"মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে, যারা বলে আমরা আল্লাহর ওপর এবং পরকালের ওপর ঈমান আনয়ন করেছি, অথচ তারা মুমিন নয়"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮]

ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে

প্রশ্ন: (১০) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জিবরাঈলে বলেছেন, ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর কিতাবের ওপর বিশ্বাস, রাসূলদের ওপর বিশ্বাস, পরকালের ওপর বিশ্বাস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। অন্য হাদীসে রয়েছে, ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। উভয় হাদীসের মধ্যে আমরা কীভাবে সমন্বয় করব?

উত্তর: যে ঈমানের মাধ্যমে আকীদাহ[19] উদ্দেশ্য, তার রুকন মোট ছয়টি। সেগুলো হাদীসে জিবরীলে উল্লেখ হয়েছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান হলো তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, ফিরিশতাদের প্রতি, আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি। অপর পক্ষে যেখানে ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা থাকার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সৎ আমল উদ্দেশ্য। এ জন্য সালাতকে ঈমানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা

[19] ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে আকীদা বলা হয়। যেমন, আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলীতে বিশ্বাস নবী-রাসূলদের ওপর বিশ্বাস ও অন্যান্য বিষয়সমূহ।

হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [البقرة: ١٤٣]

“আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতীব দয়ালু”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩]

তাফসীরকারকগণ বলেছেন, এখানে ঈমান দ্বারা বায়তুল মাকদাসের দিকে ফিরে আদায় করা সালাত উদ্দেশ্য। কেননা সাহাবীগণ কা‘বার দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের পূর্বে বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন।

প্রশ্ন: (১১) মসজিদে আসার অভ্যাস আছে এমন ব্যক্তিকে কি আমরা মুমিন হিসেবে সাক্ষ্য দিতে পারি?

উত্তর: কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের জন্য মসজিদে আসে, তার মসজিদে আসাটাই তার ঈমানের পরিচয় বহন করে। কারণ, তা না হলে কিসে তাকে ঘর থেকে বের করে মসজিদে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে বাধ্য করল?

প্রশ্নকারী যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ»

“তোমরা যদি কোনো ব্যক্তিকে মসজিদে আসতে অভ্যস্ত দেখ, তবে তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য প্রদান কর”।[20] কিন্তু এ হাদীসটি দূর্বল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয় নি।

[20] তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, সালাতের মর্যাদা অনুচ্ছেদ

আল্লাহ সম্পর্কে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা (কুমন্ত্রনা)

প্রশ্ন: (১২) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে শয়তান একজন মানুষকে এমন ওয়াস ওয়াসা (কুমন্ত্রনা) প্রদান করে যে, সে ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এ সম্পর্কে আপনার উপদেশ কী?

উত্তর: প্রশ্নকারী যে সমস্যার কথা ব্যক্ত করলেন এবং যার পরিণতিকে ভয় করছেন, আমি তাকে বলব যে, হে ভক্ত! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। উক্ত সমস্যার ভালো ফলাফল ব্যতীত মন্দ কোনো ফল হবে না। কেননা এ ওয়াস ওয়াসাগুলো শয়তান মুমিনদের মাঝে প্রবেশ করায়, যাতে সে মানুষের ঈমানকে দূর্বল করে দিতে পারে এবং তাদেরকে মানষিক অস্থিরতায় ফেলে দিয়ে ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয় অনেক সময় মুমিনদের সাধারণ জীবনকে বিপন্ন করে তুলে।

প্রশ্নকারী ব্যক্তির সমস্যাই মুমিনদের প্রথম সমস্যা নয় এবং শেষ সমস্যাও নয়; বরং দুনিয়াতে একজন মুমিন অবশিষ্ট থাকলেও এ সমস্যা বর্তমান থাকবে। সাহাবীগণও এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ»

"সাহাবীগণের একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমণ করে জিজ্ঞাসা করল, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো

কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, সত্যিই কি তোমরা এরকম পেয়ে থাক? তাঁরা বললেন হ্যাঁ, আমরা এরকম অনুভব করে থাকি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি তোমাদের ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণ"।[21]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ»

"তোমাদের কারো কাছে শয়তান আগমণ করে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে বলে কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এরকম হলে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং এরকম চিন্তা-ভাবনা করা হতে বিরত থাকে।"[22]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত,

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أُحَدِّثُ نَفْسِى بِالشَّيْءِ لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ»

---

[21] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: অন্তরের ওয়াস ওয়াসা

[22] সহীহ বুখারী, কিতাবু বাদইল খালক, অনুচ্ছেদ: ইবলিস ও তার সৈন্যদের আলোচনা

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন লোক আগমণ করে বলল, আমার মনে কখনো এমন কথার উদয় হয়, যা উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমার কাছে বেশি ভালো মনে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এ বিষয়টিকে নিছক একটি মনের ওয়াস ওয়াসা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।"[23]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ. তার কিতাবুল ঈমানে বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় কখনো কুফুরীর ওয়াস ওয়াসায় পতিত হয়। এতে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে এমন বিষয় অনুভব করে, যা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আকাশ থেকে জমিনে পড়ে যাওয়াকে অধিক শ্রেয় মনে করে। এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহা ঈমানের সুস্পষ্ট আলামত। অন্য বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি শয়তানের কুমন্ত্রণাকে নিছক একটি মনের ওয়াস ওয়াসা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। মুমিন ব্যক্তি এ ধরণের ওয়াস ওয়াসাকে অপছন্দ করা সত্বেও তার মনে এর উদয় হওয়া এবং তা প্রতিহত করতে প্রাণপন চেষ্টা করা তার ঈমানদার হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন কোনো মুজাহিদের সামনে শত্রু এসে উপস্থিত হলো।

[23] আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ: ওয়াস ওয়াসা প্রতিরোধ

মুজাহিদ শত্রুকে প্রতিহত করল এবং পরাজিত করল। এটি একটি বিরাট জিহাদ।[24] এ জন্যই ইলম অর্জনকারী ও ইবাদাতে লিপ্ত ব্যক্তিগণ বেশি বেশি ওয়াস ওয়াসা এবং সন্দেহে পতিত হয়ে থাকে। অথচ অন্যদের এ রকম হয় না। শয়তানের উদ্দেশ্যও তাই। অপর পক্ষে যারা ইলম অর্জন এবং ইবাদাতের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের পথে চলে, শয়তান তাদের শত্রু। সে তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে চায়।

প্রশ্নকারীকে আমি বলব যে, যখন আপনি বুঝতে পারবেন, এটা শয়তানের কুমন্ত্রনা, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হোন। আর জেনে রাখুন যে, আপনি যদি তার সাথে সদা-সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, তার পিছনে না ছুটেন, তাহলে সে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ»

“আমলে পরিণত করা অথবা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াস ওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।”[25]

---

[24] অনুরূপভাবে শয়তানের ওয়াস ওয়াসাকে প্রতিহত করাও একটি বড় জিহাদ।

[25] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: গোলাম আযাদ করা, অনুচ্ছেদ: তালাক এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি প্রসঙ্গে; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ: মনের কুমন্ত্রনা...।

আপনাকে যদি বলা হয় শয়তান মনের ভিতরে ওয়াস ওয়াসা দেয় তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? সেটাকে আপনি কি সত্য মনে করেন? আপনার মনে আল্লাহ সম্পর্কে যে ধরণের ওয়াস ওয়াসার উদয় হয়, তার ব্যাপারে আপনার ধারণা কি তাই? উত্তরে আপনি অবশ্যই বলবেন, এ ব্যাপারে আমাদের কথা বলা সম্পূর্ণ অনুচিত। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র। এটি একটি বিরাট অপবাদ। আপনি অন্তর দিয়ে মনের এ সব ওয়াস ওয়াসাকে ঘৃণা করবেন এবং জবানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করবেন। আর আপনি এ থেকে দূরে থাকবেন। সুতরাং এগুলো শুধুমাত্র মনের কল্পনা এবং ওয়াস ওয়াসা, যা আপনার অন্তরে প্রবেশ করে থাকে। এটি একটি শয়তানের ফাঁদ। মানুষকে শির্কে লিপ্ত করার জন্যই সে এ ধরণের ফাঁদ পেতে রেখেছে। মানুষকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান তাদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করে থাকে।

সামান্য কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রনা দেয় না। আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনবসতিপূর্ণ বড় বড় শহরের কথা শ্রবণ করে থাকেন। এ সমস্ত শহরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয় না অথবা এ ধরণের সন্দেহ হয় না যে, শহরটি বসবাসের উপযোগী নয় অথবা শহরে কোনো জন-মানুষ নেই। এ ক্ষেত্রে সন্দেহ না হওয়ার কারণ হলো শয়তানের এতে কোনো লাভ নেই। দেওয়ার ভিতরে শয়তানের বিরাট স্বার্থ রয়েছে। জ্ঞানের আলো এবং হিদায়াতের নূরকে মানুষের অন্তর থেকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ও তাকে সন্দেহ এবং পেরেশানীর অন্ধকার গলিতে নিক্ষেপ করার জন্য শয়তান তার অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে বাঁচার উপযুক্ত ঔষধও আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। এসব ধারণা থেকে বিরত থাকা এবং শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। মুমিন ব্যক্তি যদি ওয়াস ওয়াসা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ইবাদাতে লিপ্ত হয়, আল্লাহর ইচ্ছায় অন্তর থেকে উহা চলে যাবে। সুতরাং আপনার অন্তরে এ জাতীয় যা কিছু উদয় হয়, তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকুন। আপনি তো আল্লাহর ইবাদাত করেন, তাঁর কাছে দো'আ করেন এবং তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করেন। আপনার অন্তরে যে সমস্ত কুধারণার উদয় হয়, তার বর্ণনা যদি অন্যের কাছ থেকে শুনেন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলতে ইচ্ছা করবেন। তাই যে সমস্ত ওয়াস ওয়াসা মনের মধ্যে জাগে, তার প্রকৃত কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং তা ভিত্তিহীন মনের কল্পনা মাত্র। এমনিভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্র কাপড় পরিধানকারী কোনো ব্যক্তির মনে যদি এমন ওয়াস্ওয়ার জাগ্রত হয় যে, হয়তোবা কাপড়টি নাপাক হয়ে গেছে, হয়তোবা এ কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না, এমতাবস্থায় সে উক্ত ওয়াস ওয়াসার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। উপরোক্ত আলোচনার পর আমার সংক্ষিপ্ত নসীহত এই যে,

1) ওয়াস ওয়াসার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ মোতাবেক ওয়াস ওয়াসা থেকে সম্পূর্ণ

বিরত থাকবে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

2) বেশী করে আল্লাহর যিকির করবে।

3) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে ইবাদাতে লিপ্ত থাকবে। যখনই বান্দা পরিপূর্ণরূপে ইবাদাতে মশগুল থাকবে, ইনশাআল্লাহ এধরণের কুচিন্তা দূর হয়ে যাবে।

4) এই রোগ থেকে আল্লাহর কাছে আরোগ্য লাভের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দো'আ করবে।

প্রশ্ন: (১৩) কাফিরের ওপর কি ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব?

উত্তর: প্রত্যেক কাফিরের ওপরই ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব। চাই সে কাফির ইয়াহূদী হোক বা খৃষ্টান হোক। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানবমণ্ডলী! আমি আকাশ-জমিনের রাজত্বের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সবার নিকট প্রেরিত রাসূল। তিনি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তোমরা সবাই আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর প্রেরিত নিরক্ষর নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ

কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনয়ন করা সমস্ত মানুষের ওপর ওয়াজিব। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশেষ অনুগ্রহ করে অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের আইন-কানুন মেনে মুসলিম দেশে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন।

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩﴾ [التوبة: ٢٩]

“তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ এবং রোজ হাশরের উপর ঈমান রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) প্রদান করে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৯]

সহীহ মুসলিমে বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধে কাউকে আমীর নির্বাচন করতেন, তখন তাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিতেন। আরো উপদেশ দিতেন সাথীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার। আর বলতেন, তাদের সামনে তিনটি বিষয় পেশ করবে, তিনটির যে কোনো

একটি গ্রহণ করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।[২৬] এ সমস্ত বিষয়সমূহের মধ্যে জিযিয়া গ্রহণ অন্যতম। অনেক আলিম ইয়াহূদী-খৃষ্টান ছাড়াও অন্যান্য কাফির-মুশরিকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ বৈধ বলেছেন।

মোটকথা অমুসলিমদের ওপর আবশ্যক হলো, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামী শরী'আতের কাছে নতি স্বীকার করে কর দিয়ে ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করবে।

প্রশ্ন: (১৪) যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব দাবী করবে, তার হুকুম কী?

উত্তর: যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব দাবী করবে সে কাফির। তা'আলাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٦٥﴾ [النمل: ٦٥]

"হে নবী আপনি বলে দিন! আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের সংবাদ জানে না এবং তারা জানে না যে, কখন পুনরুত্থিত হবে।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

যেহেতু আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মর্মে ঘোষণা করার আদেশ দিয়েছেন, আকাশ-জমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না, এরপরও যে ব্যক্তি গায়েবের খবর জানার দাবী করবে, সে আল্লাহকে এ

---

[26] সহীহ মুলিম শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: আমীর নির্বাচন

ব্যাপারে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। যারা ইলমে গায়েবের দাবী করে, তাদেরকে আমরা বলব, তোমরা কীভাবে এটা দাবী কর অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতেন না। তোমরা বেশি মর্যাদাবান না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? যদি তারা বলে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বেশি মর্যাদাবান, তাহলে তারা এ কথার কারণে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি মর্যাদাবান, তাহলে আমরা বলব কেন তিনি গায়েবের সংবাদ জানেন না? অথচ তোমরা তা জান বলে দাবী করছ? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا ٢٧﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

"তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না- তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]

ইলমে গায়েবের দাবীদারদের কাফির হওয়ার এটি দ্বিতীয় দলীল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে মানুষের জন্য ঘোষণা করতে বলেন যে,

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ﴾ [الانعام: ٥٠]

“আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার আছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য জগতের বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার নিকট প্রেরণ করা হয়।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০]

মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহই ভালো জানেন:

প্রশ্ন: (১৫) বর্তমান কালের ডাক্তারগণ মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান আছে না কন্যা সন্তান বলে দিতে পারে। আর কুরআনে আছে, وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ অর্থ: "মাতৃগর্ভে কী আছে তা আল্লাহই জানেন।" ইবন জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী কি সন্তান প্রসব করবে? তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়। কাতাদা থেকেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। আল্লাহর বাণী, مَا فِي الأَرْحَامِ "গর্ভে যা আছে" এ কথাটি ব্যাপক। এ ব্যাপকতা ভঙ্গকারী বিশেষ কোনো দলীল আছে কী? অর্থাৎ কোনো অবস্থাতে আল্লাহ ছাড়া অন্যরাও কি মাতৃগর্ভের অবস্থা সম্পর্কে খবর রাখতে পারে?

উত্তর: উপরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, কুরআনের কোনো আয়াত কখনই বাস্তব সত্য কোনো ঘটনার বিরোধী হতে পারে না। যদিও কখনো কোনো ব্যাপারে প্রকাশ্যভাবে এ রকম কিছু দেখা যায়, তবে হয়তো এটা হবে নিছক অবাস্তব দাবী অথবা কুরআনের আয়াতটি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। কেননা কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত এবং প্রকৃত বাস্তব ঘটনা উভয়টিই অকাট্য। দু'টি অকাট্য বিষয়ের মধ্যে কখনো বিরোধ হতে পারে না।

প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়টি সত্য হয়ে থাকলে বলব যে, অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে তারা এখন জানতে পেরেছে যে, মাতৃগর্ভে কি আছে। বর্তমানে ডাক্তারগণ ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়া সম্পর্কে যে আগাম খবর প্রদান করে, তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে কোনো কথা নেই। আর যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলেও আয়াতের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আয়াতটি গায়েবী বিষয় সংক্রান্ত। এখানে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। তম্মধ্যে মাতৃগর্ভে কি আছে তা একটি। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হলো সে কত দিন মায়ের পেটে থাকবে, কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, কি রকম আমল করবে, সে কতটুকু রিযিক গ্রহণ করবে, সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগ্যবান হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ছেলে না মেয়ে হবে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া। আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পরে মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞানের মতই হয়ে গেল। তবে শিশুটি তিনটি অন্ধকারের ভিতরে লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে। যদি অন্ধকারের আবরণগুলো অপসারণ করা হয়, তাহলে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে। ইহা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে এমন শক্তিশালী যন্ত্র রয়েছে, যা এ তিনটি অন্ধকার ভেদ করতে সক্ষম। যাতে করে শিশুটি ছেলে না মেয়ে, তা জানা যায়। আর আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে- একথা বলা হয় নি। হাদীসেও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

আয়াতের শানে নুযুলের ক্ষেত্রে মুজাহিদ থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা মুনকাতে।[27] কারণ তিনি তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত।

কাতাদার তাফসীরের অর্থ এ যে, গঠন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ ব্যতীত অন্যরাও জানতে পারে। ইবন কাছীর সূরা লুকমানের আয়াতের তাফসীরে বলেন, মাতৃগর্ভে যা আছে তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কি সৃষ্টি করতে চান, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কিন্তু যখন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার কিংবা সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান হওয়ার আদেশ দিয়ে দেন, তখন ফিরিশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবেরাও জানে। আল্লাহর বাণী,

﴿وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ﴾ [لقمان: ٣٤]

"মাতৃগর্ভে যা আছে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।" [সূরা লুকমান, আয়াত: ৩৪]

এ থেকে মানুষ কোনো কিছু জানতে পারে কিনা। জানলে তা কিসের মাধ্যমে? এ প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, আয়াতের মাধ্যমে যদি গঠন প্রণালী পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝি যে, মাতৃগর্ভের ছোট-বড় যাবতীয় অবস্থা আল্লাহ তা'আলা

---

[27] মুনকাতে সেই হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ হতে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়। হাদীসের সনদ হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কারণে হাদীস দূর্বল হয়ে যায়।

বিস্তারিতভাবে অবগত আছেন। মানুষ শুধুমাত্র গঠন পূর্ণ হওয়ার পর ছেলে না মেয়ে এ একটি মাত্র অবস্থা জানতে পারে। আরো অসংখ্য অবস্থা এখনও রহস্যময় রয়ে গেছে। উসূলবিদগণ[28] উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাপকার্থক বিষয়গুলো থেকে কোনো জিনিসকে আলাদা করার জন্য কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলীল কিংবা ইজমা[29] বা কিয়াস[30] বা বাস্তব উপলোব্ধি অথবা বিশুদ্ধ বিবেকের[31] দরকার। এ ব্যাপারে আলিমদের আলোচনা অত্যন্ত পরিস্কার।

আর আয়াতের মাধমে যদি সন্তান সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ডাক্তারদের কথা এবং কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ডাক্তাররা সন্তান সৃষ্টির হওয়ার পূর্বে বলতে পারে না যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে।

আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা যে, পৃথিবীতে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল বিরোধী কোনো বাস্তব ঘটনা পাওয়া যায় নি। ইসলামের শত্রুরা কিছু কিছু বাস্তব বিষয়ে বাহ্যিকভাবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী ভেবে তাতে আঘাত করেছে। আল্লাহর কিতাব বুঝতে অক্ষম হওয়ার কারণে অথবা

---

[28] কুরআন-সন্নাহর থেকে গবেষণা করে যারা দীনের মাসায়েল বের করার মূলনীতি নির্ধারণ করেন তাদেরকে উসূলবিদ (উসূলী) বলা হয়।

[29] কুরআন-সুন্নার কোন বিধানের উপর মুসলিম উম্মাহর সকল আলেমদের একমত হওয়াকে ইজমা বলা হয়।

[30] দীনের কোন মাসআলায় কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীল না থাকলে সেখানে বিশুদ্ধ কিয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

[31] বিশুদ্ধ বিবেক ও বাস্তব সত্য কখনও কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হতে পারে না।

তাদের উদ্দেশ্য অসৎ হওয়ার কারণেই তারা এমনটি করে থাকে; কিন্তু মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে মানুষ তিনভাগে বিভক্ত:

প্রথম শ্রেণির লোকেরা কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থটিকে গ্রহণ করেছে এবং এর বিপরীতে প্রতিটি বাস্তব সত্য বিষয়কে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ আয়াতটি উক্ত অর্থে সুস্পষ্ট নয়। এতে করে সে নিজের অক্ষমতার কারণে নিজের ওপর কিংবা কুরআনের ওপর দোষ টেনে এনেছে।

অন্য একটি দল কুরআনের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে পার্থিব বিষয়কেই গ্রহণ করার কারণে নাস্তিকে পরিণত হয়েছে।

অন্য দিকে মধ্যমপন্থী দলের লোকেরা কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাস্তব সত্য বিষয়াবলীকেই সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তারা জানে যে, উভয়টিই সত্য। কারণ, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতগুলো চাক্ষুষ বস্তুগুলোর বিরোধী হতে পারে না। তারা দলীল এবং বিবেক সম্মত বিষয়, উভয়টির ওপরই আমল করে। এর মাধ্যমে তাদের দীন এবং বিবেক উভয়টিই নিরাপদ থাকল। ঈমানদারগণ যখন সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আমাদের দীনী ভাইদেরকে তাওফীক দান করুন এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী ও উম্মতের জন্য সংশোধনকারী নেতা হিসাবে নির্ধারণ করুন। আমি আল্লাহর কাছে তাওফীক চাই, তারই ওপর ভরসা করি এবং তারই দিকে ফিরে যাব।

সূর্য ঘুরে না পৃথিবী?

প্রশ্ন: (১৬) সূর্য কি পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে?

উত্তর: মান্যবর শাইখ উত্তরে বলেন যে, শরী'আতের প্রকাশ্য দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্যই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে। এ ঘুরার কারণেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রির আগমণ ঘটে। আমাদের হাতে এ দলীলগুলোর চেয়ে বেশি শক্তিশালী এমন কোনো দলীল নেই, যার মাধ্যমে আমরা সূর্য ঘূরার দলীলগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি। সূর্য ঘুরার দলীলগুলো হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأۡتِي بِٱلشَّمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡرِقِ فَأۡتِ بِهَا مِنَ ٱلۡمَغۡرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

"আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৮] সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠার মাধ্যমে প্রকাশ্য দলীল পাওয়া যায় যে, সূর্য পৃথিবীর উপর পরিভ্রমণ করে।

২) আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمۡسَ بَازِغَةٗ قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَآ أَكۡبَرُۖ فَلَمَّآ أَفَلَتۡ قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ٧٨﴾ [الانعام: ٧٨]

"অতঃপর যখন সূর্যকে চকচকে অবস্থায় উঠতে দেখলেন তখন বললেন, এটি আমার রব, এটি বৃহত্তর। অতপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসব বিষয়ে শরীক কর আমি ওসব থেকে মুক্ত।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৭৮]

এখানে নির্ধারণ হয়ে গেল যে, সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায়। একথা বলা হয় নি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী ডুবে গেল। পৃথিবী যদি ঘূরত তাহলে অবশ্যই তা বলা হত।

৩) আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَرَى ٱلشَّمۡسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهۡفِهِمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ﴾ [الكهف: ١٧]

“তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১৭] পাশ কেটে ডান দিকে বা বাম দিকে চলে যাওয়া প্রমাণ করে যে, নড়াচড়া সূর্য থেকেই হয়ে থাকে। পৃথিবী যদিনড়াচড়া করত তাহলে অবশ্যই বলতেন সূর্য থেকে গুহা পাশ কেটে যায়। উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়াকে সূর্যের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যই ঘুরে। পৃথিবী নয়।

৪) আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ٣٣﴾ [الانبياء: ٣٣]

“এবং তিনিই দিবা-নিশি এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সবাই আপন আপন কক্ষ পথে বিচরণ করে।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৩]

ইবন আব্বাস বলেন, লাটিম যেমন তার কেন্দ্র বিন্দুর চার দিকে ঘুরতে থাকে, সূর্যও তেমনিভাবে ঘুরে।

৫) আল্লাহ বলেন,

﴿يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا﴾ [الاعراف: ٥٤]

“তিনি রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিনের মাধ্যমে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

আয়াতে রাতকে দিনের অনুসন্ধানকারী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারী পিছনে পিছনে দ্রুত অনুসন্ধান করে থাকে। এটা জানা কথা যে, দিবা-রাত্রি সূর্যের অনুসারী।

৬) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمًّىۗ أَلَا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ ٥﴾ [الزمر: ٥]

“তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫]

আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, পৃথিবীর উপরে দিবা-রাত্রি চলমান রয়েছে। পৃথিবী যদি ঘুরতো তাহলে তিনি বলতেন, দিবা-রাত্রির উপর পৃথিবীকে ঘূরান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সূর্য এবং চন্দ্রের প্রত্যেকেই চলমান"। এ সমস্ত দলীলের মাধ্যমে জানা গেল যে, সুস্পষ্টভাবেই সূর্য ও চন্দ্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চলমান বস্তুকে বশীভুত করা এবং কাজে লাগানো একস্থানে অবস্থানকারী বস্তুকে কাজে লাগানোর চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত।

৭) আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ۝١ وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ۝٢﴾ [الشمس: ١، ٢]

"শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।" [সূরা আশ-শামস, আয়াত: ১-২]

এখানে বলা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্যের পরে আসে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সূর্য এবং চন্দ্র চলাচল করে এবং পৃথিবীর উপর ঘুরে। পৃথিবী যদি চন্দ্র বা সূর্যের চার দিকে ঘুরত, তাহলে চন্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করতনা। বরং চন্দ্র একবার সূর্যকে, আর একবার সূর্য চন্দ্রকে অনুসরণ করত। কেননা সূর্য চন্দ্রের অনেক উপরে। এ আয়াত দিয়ে পৃথিবী স্থীর থাকার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করার ভিতরে চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৮) মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ٣٨ وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ٣٩ لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِۚ وَكُلّٞ فِي فَلَكٖ يَسۡبَحُونَ ٤٠﴾ [يس: ٣٨، ٤٠]

“সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্ধারণ। চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। রাতের পক্ষেও দিনের অগ্রবর্তী হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৩৮-৪০]

সূর্যের চলা এবং এ চলাকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারণ বলে ব্যাখ্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, সূর্য প্রকৃতভাবেই চলমান। আর এ চলাচলের কারণেই দিবা-রাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তন হয়। চন্দ্রের জন্য মঞ্জিল নির্ধারণ করার অর্থ এ যে, সে তার মঞ্জিলসমূহে স্থানান্তরিত হয়। যদি পৃথিবী ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর জন্য মঞ্জিল নির্ধারণ করা হত। চন্দ্রের জন্য নয়। সূর্য কর্তৃক চন্দ্রকে ধরতে না পারা এবং দিনের অগ্রে রাত থাকা সূর্য, চন্দ্র, দিন এবং রাতের চলাচলের প্রমাণ বহন করে।

৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যরকে বলেছেন,

«أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا»

“হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য যখন অস্ত যায় তখন কোথায় যায়? আবু যার বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ‘আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। অতঃপর তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন অনুমতি চাবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফেরত যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকেই উদিত হবে।”[32]

এটি হবে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে। আল্লাহ সূর্যকে বলবেন, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফেরত যাও, অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্য পৃথিবীর উপরে ঘুরছে এবং তার এ ঘুরার মাধ্যমেই উদয়-অস্ত সংঘটিত হচ্ছে।

১০) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া এবং ঢলে যাওয়া এ কাজগুলো সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সূর্য থেকে প্রকাশিত হওয়া খুবই সুস্পষ্ট। পৃথিবী হতে নয়।

[32] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: বাদউল খালক; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান

হয়তো এ ব্যাপারে আরো দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সেগুলো আমার এ মুহূর্তে মনে আসছেনা। তবে আমি যা উল্লেখ করলাম, এ বিষয়টির দ্বার উম্মুক্ত করবে এবং আমি যা উদ্দেশ্য করেছি, তা পূরণে যথেষ্ট হবে। আল্লাহর তাওফীক চাচ্ছি!

প্রশ্ন: (১৭) আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার ঘোষণা দেওয়া ইসলামে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ। এ সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়া'য রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামান দেশে পাঠানোর সময় আদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি সর্বপ্রথম এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।[৩৩]

প্রথম বাক্যটি অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। সেই সাথে মুখে এ কালেমাটির উচ্চারণ করবে।

[33] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মাগাযী; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

যার দাসত্ব ও উপাসনা করা হয় তার নাম ইলাহ। (لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ বাক্যটির দু'টি অংশ। একটি 'না' বাচক অংশ অপরটি 'হ্যাঁ' বাচক অংশ। "লা-ইলাহা" কথাটি 'না' বাচক এবং "ইল্লাল্লাহ" কথাটি 'হ্যাঁ' বাচক। প্রথমে সমস্ত বাতিল মা'বূদের জন্য কৃত সকল প্রকার ইবাদাতকে অস্বীকার করে দ্বিতীয় বাক্যে তা একমাত্র হক্ক মা'বূদ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

"লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই।' যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি কীভাবে বললেন আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই? অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাস্তবে আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য মা'বূদের উপাসনা করা হচ্ছে। আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করা হচ্ছে আল্লাহও তাদেরকে মা'বূদ হিসাবে নাম রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَآ أَغۡنَتۡ عَنۡهُمۡ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ لَّمَّا جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَۖ﴾

[هود: ١٠١]

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বূদকে ডাকত, আপনার রবর হুকুম যখন এসে পড়বে, তখন কেউ কোনো কাজে আসবেনা।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১০১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ﴾ [الاسراء: ٣٩]

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বূদ স্থির করবেন না"। (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৯]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۘ﴾ [القصص: ٨٨]

“আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা‘বূদ ডেকো না।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৮]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ﴾ [الكهف: ١٤]

“আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা‘বূদকে আমরা কখনই আহ্বান করব না।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১৪]

এখন আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা‘বূদ নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে গাইরুল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাত উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমরাই বা কীভাবে গাইরুল্লাহর জন্য ইবাদাত সাব্যস্ত করতে পারি? অথচ রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছেন,

﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ﴾ [الاعراف: ٥٩]

“তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মা‘বূদ নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৯]

উপরোক্ত সমস্যার উত্তর এ যে, “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বাক্যটির মধ্যে ইলাহা কথাটির পরে হাক্কুন শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে বাক্যটি এরকম হবে, (لا اله حق الا الله) (লা-ইলাহা হাক্কুন ইল্লাল্লাহ) হাক্কুন শব্দটি উহ্য

মানলেই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তাই আমরা বলব আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, তারাও মা'বূদ কিন্তু এগুলো বাতিল মা'বূদ। ইবাদাত বা দাসত্ব পাওয়ার তাদের কোনো অধিকার নেই। ,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٣٠﴾ [لقمان: ٣٠]

"এটিই প্রমাণিত যে, আল্লাহ-ই সত্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের উপাসনা করে তারা সবাই মিথ্যা। আল্লাহ সর্বোচ্চ সুমহান।" [সূরা লুকমান, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَرَءَيۡتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلۡعُزَّىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ ٢٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلۡأُنثَىٰ ٢١ تِلۡكَ إِذٗا قِسۡمَةٞ ضِيزَىٰٓ ٢٢ إِنۡ هِيَ إِلَّآ أَسۡمَآءٞ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ ٢٣﴾ [النجم: ١٩، ٢٣]

"তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও ওয্যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। এগুলো কতগুলো নাম ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তোমরা নিজেরা রেখেছ এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রেখেছে। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেন নি।" [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯-২৩]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ﴾ [يوسف: ٤٠]

“তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা নাম করণ করে নিয়েছো। আল্লাহ এদের পক্ষে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪০]

সুতরাং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। মা‘বূদগুলো সত্য মা‘বূদ নয়। বরং তা বাতিল উপাস্য।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ এই যে, অন্তরে বিশ্বাস এবং মুখে এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ সমস্ত জিন্ন ও মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন যে, হে মানবমণ্ডলী তোমাদের প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, সমগ্র আসমান ও জমিনের রাজত তাঁর।

একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর ওপর, তার প্রেরিত উম্মী নবীর ওপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর ওপর এবং তাঁর সমস্ত কালামের ওপর। তাঁর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৮]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ [الفرقان: ١]

“পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফায়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারেন।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো,

(১) তিনি যে বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, তা বিশ্বাস করা,

(২) তাঁর আদেশ মান্য করা,

(৩) তিনি যে বিষয় নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা

(৪) তাঁর নির্দেশিত শরী‘আত অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

(৫) তাঁর শরী‘আতে নতুন কোনো বিদ‘আত সৃষ্টি না করা।

এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার অন্যতম দাবী হলো সৃষ্টি বা পরিচালনায় এবং প্রভুত্বে কিংবা ইবাদাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো অধিকার নেই; বরং তিনি আবদ বা আল্লাহর দাস ও বান্দা। মা'বূদ নন। তিনি সত্য রাসূল। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যাবে না। তিনি নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন না। মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের একমাত্র মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ﴾ [الانعام: ٥٠]

"আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফিরিশতা। , যা আমার কাছে আসে।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫০]

সুতরাং তিনি একজন আদেশপ্রাপ্ত বান্দা মাত্র। তাঁর প্রতি যা আদেশ করা হয় তিনি কেবল মাত্র তারই অনুসরণ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢﴾ [الجن: ٢١، ٢٢]

"বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি আশ্রয়স্থল পাবো না।" [সূরা

আল-জিন্ন, আয়াত: ২১-২২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٨]

“আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েবের খবর জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কখনো কোনো অমঙ্গল হতনা। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮] এটাই হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদূর রাসূলুল্লাহ এর প্রকৃত অর্থ।

হে প্রিয় পাঠক! এ অর্থের মাধ্যমেই আপনি জানতে পারলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অন্য কোনো মাখলুক ইবাদাতের অধিকারী নয়। ইবাদাতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি

তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল মুসলিম।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা যে সম্মান দান করেছেন, তাতে অধিষ্ঠিত করাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যথেষ্ট। তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মর্যাদাবান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাঁর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সীমাহীন শান্তির ধারা বর্ষিত হোক।

প্রশ্ন: (১৮) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কীভাবে তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে?

উত্তর: "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ পবিত্র বাক্যটি তাওহীদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কখনো প্রকাশ্যভাবে আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথে বাহ্যিকভাবে তাওহীদে উলুহিয়্যাতকেই বুঝায়। তবে তা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতকেও শামীল করে। কেননা যারা আল্লাহর ইবাদাত করে তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতকে স্বীকার করে বলেই তা করে থাকে। এমনিভাবে তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, যার কোনো ভালো নাম ও গুণাবলী নেই মানুষ কখনই তার ইবাদাত করতে রাজি হবে না। এ জন্যই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا﴾ [مريم: ٤٢]

"হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনো উপকারে আসেনা, তার ইবাদাত কেন কর?" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪২]

সুতরাং তাওহীদে উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি তাওহীদে রুবুবিয়্যাত ও তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন: (১৯) মানুষ এবং জিন্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আল্লাহর সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম এবং আল্লাহর শরী‘আত সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহর নিম্মোক্ত বাণীসমূহে

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢]

“তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ২]

আল্লাহর বাণী,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٢٤]

“নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৪]

এছাড়া আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন এবং যার আদেশ প্রদান করেন তাতে তিনি মহা কৌশলী। তিনি যাই সৃষ্টি করেন না কেন, তার পিছনে রয়েছে এক বিরাট উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের জন্য যে শরী‘আত দিয়েছেন, তার ভিতরেও রয়েছে এক বিরাট হিকমত। চাই কোনো বস্তু ওয়াজিব করার ভিতরে হোক কিংবা হারাম করার ভিতরে হোক। অথবা বৈধ করার মাঝেই হোক না কেন। এ হিকমত আমরা কখনো জানতে পারি আবার কখনো জানতে পারিনা। আল্লাহ প্রদত্ব জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো কিছু লোকে জানে আবার অনেকে জানেই না। তাই আমরা বলব যে, আল্লাহ তা‘আলা জিন্ন এবং মানুষকে এক বিরাট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ۝٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জিন্ন এবং মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝١١٥﴾ [المؤمنون: ١١٥]

“তোমরা কি ধারণা করেছ যে, আমি তোমাদেরকে এমনিই সৃষ্টি করেছি? আর তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৫] আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝٣٦﴾ [القيامة: ٣٦]

“মানুষ কি ধারণা করে যে, তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে?” [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬]

এছাড়া আরো অনেক আয়াত প্রমাণ করে যে, জিন্ন-ইনসানের সৃষ্টিতে আল্লাহ তা‘আলার এক মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো আল্লাহর ইবাদাত করা। ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আল্লাহর আদেশসমূহ বাস্তবায়ন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়ার নাম ইবাদাত। তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ [البينة: ٥]

“তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে আল্লাহর ইবাদাত করবে।” [সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

এ হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার করবে, সে ব্যক্তি এ হিকমত প্রত্যাখ্যানকারী হিসাবে

গণ্য হবে। যার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা না করলে কি হবে তাদের কর্মসমূহ প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহর কাছে দো'আ কবূল হওয়ার শর্ত

প্রশ্ন: (২০) কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে দো'আ করে থাকে; কিন্তু দো'আ কবূল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব"। তাহলে মানুষ কীভাবে আল্লাহর কাছে দো'আ করলে তা কবূল হবে?

উত্তর: বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম পেশ করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর ওপর। মুসলিম ভাইদের জন্য আল্লাহর কাছে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক পথের তাওফীক প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে"। [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

প্রশ্নকারী বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে দো‘আ করে থাকেন। অথচ আল্লাহ তার দো‘আ কবূল করেন না। ফলে তার কাছে এ অবস্থা কঠিন বলে মনে হয়। বিশেষ করে আল্লাহ তো ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দো‘আ করে, আল্লাহ তার দো‘আ কবূল করেন। আল্লাহ কখনই ওয়াদা খেলাফ করেন না। উক্ত প্রশ্নের জবাবে আমরা বলব যে, দো‘আ কবূলের জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। তা সর্ববস্থায় দো‘আর ক্ষেত্রে বর্তমান থাকতে হবে।

প্রথম শর্ত: একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা। অন্তরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে, এ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা যে, আল্লাহ কবূল করতে সক্ষম। দো‘আ করার সময় এ আশা রাখবে যে, আল্লাহ তা কবূল করবেন।

দ্বিতীয় শর্ত: দো‘আ করার সময় এ কথা অনুভব করবে যে, দো‘আ কবূলের দিকে সে খুবই মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয় বরং এ কথাও অনুভব করবে যে, একমাত্র আল্লাহই বিপদগ্রস্থ ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদ শ্রবণ করেন এবং তিনিই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। যদি এ কথা অনুভব করে যে, সে আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী নয় এবং আল্লাহর কাছে তার কোনো প্রয়োজনও নেই; বরং দো‘আ করাটা যেন একটা অভ্যাসমাত্র তাহলে এ ধরণের দো‘আ কবূল না হওয়ারই উপযোগী।

তৃতীয় শর্ত: হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকবে। কারণ, বান্দা এবং তার দো‘আ কবূল হওয়ার মধ্যে হারাম রুযী প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١﴾ [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»

“নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলদের প্রতি যা নির্দেশ দিয়েছেন, মুমিনদের প্রতিও তাই নির্দেশ দিয়েছেন।” তিনি বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١﴾ [المؤمنون: ٥١]

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার্য গ্রহণ কর এবং সৎ কর্ম কর।” [সুরা আল-মুমিনূন, আযাত: ৫১] আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ [البقرة: ١٧٢]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী থেকে আহার গ্রহণ কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭২]

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ

করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলায়িত কেশ ও ধুলামিশ্রিত পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে হে, রব! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দো'আ কবূল হতে পারে?"[34]

দো'আ কবূলের সকল মাধ্যম অবলম্বন করা সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ লোকের দো'আ কবূল হওয়াকে অসম্ভব মনে করলেন। দো'আ কবূলের কারণগুলো নিম্নরূপঃ

১) আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা আকাশে 'আরশের উপরে। আল্লাহর দিকে হাত উঠানো দো'আ কবূলের অন্যতম কারণ। হাদীসে এসেছে,

«إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

"নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও সম্মানী। বান্দা যখন তাঁর দিকে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করে, তখন তিনি হাত দু'টিকে খালি অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জা বোধ করেন।"[35]

২) এ লোকটি আল্লাহর একটি নাম (رب) 'পালনকর্তা' উচ্চারণ করে করে দো'আ করেছে। এ নামের উসীলা গ্রহণ করা দো'আ কবূলের

[34] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত

[35] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুদ দাওয়াত

অন্যতম কারণ। কেননা রব অর্থ রব, সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টিকারী ও পরিচালনাকারী। তাঁর হাতেই আকাশ-জমিনের চাবি-কাঠি। এ জন্যই আপনি কুরআন মজীদের অধিকাংশ দো‘আতেই দেখতে পাবেন, ‘রব’ বা রব শব্দটি উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۖ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ١٩٤ فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ ١٩٥ ﴾ [ال عمران: ١٩٣، ١٩٥]

“হে আমাদের রব! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের রবর প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদিগকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না। অতঃপর তাদের রব তাদের দো‘আ এ বলে কবূল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী লোক হোক। তোমরা সকল নারী-পুরুষই সমান।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৩-১৯৫] সুতরাং আল্লাহর এ নামের (রব) মাধ্যমে উসীলা দেওয়া দো‘আ কবূলের অন্যতম কারণ।

৩) এ লোকটি মুসাফির ছিল। সফর করাকে অধিকাংশ সময় দো‘আ কবূলের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা সফর অবস্থায় মানুষ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। স্বদেশে অবস্থানকারীর চেয়ে মুসাফির আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মুসাফির এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধানকারী হয়। কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। আল্লাহর কাছে দো‘আ করা ব্যতীত তার অন্য কোনো উপায় নেই। সফরে থেকে এলোকেশ বিশিষ্ট হয়ে ও ময়লাযুক্ত পোশাক পরিহিত অবস্থায় দো‘আ করা দো‘আ কবূলের পক্ষে খুবই সহায়ক। হাদীসে আছে, আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন বিকাল বেলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং আরাফাতে অবস্থানকারীদেরকে নিয়ে ফিরিশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, “প্রতিটি অঞ্চল হতে তারা আমার কাছে এসেছে, ধুলা-মলিন পোষাক নিয়ে এবং এলোকেশ বিশিষ্ট অবস্থায়।[36]

যাই হোক দো‘আ কবূলের উপরোক্ত কারণগুলো থাকা সত্বেও কোনো কাজ হলো না। কারণ, একটাই তার খাদ্য-পানীয় ছিল হারাম, পোষাক ছিল হারাম এবং হারাম খেয়ে তার দেহ গঠিত হয়েছে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কি ভাবে তার দো‘আ কবূল করা হবে? দো‘আ কবূলের এ শর্তগুলো পাওয়া না গেলে দো‘আ কবূলের কোনই সম্ভাবনা নেই। শর্তগুলো বর্তমান থাকার পরও যদি দো‘আ কবূল না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কি কারণে দো‘আ কবূল হয়

[36] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল হজ।

নি, তা আল্লাহই ভালো জানেন। দো‘আকারী এ বিষয়ে জানার কোনো সুযোগ নেই। দো‘আ কবূলের সকল শর্ত বর্তমান থাকার পরও দো‘আ কবূল না হলে হতে পারে আল্লাহ তার ওপর থেকে দো‘আ কবূলের চেয়ে বড় কোনো মুসীবত দূর করবেন অথবা এও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনের জন্য তার দো‘আকে সঞ্চয় করে রাখবেন এবং সেদিন তাকে অধিক পরিমাণে বিনিময় দান করবেন। কেননা ব্যক্তি দো‘আ কবূলের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করে আল্লাহর কাছে দো‘আ করার পরও দো‘আ কবূল করা হয় নি এবং তার উপর থেকে বড় কোনো মুসিবতও দূর করা হয় নি। দো‘আ কবূলের সকল শর্ত পূরণ করে দো‘আ করেছে। কিন্তু দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়ার জন্য তার দো‘আ কবূল করা হয় নি। দো‘আ করার কারণে এবং অন্য একটি পুরস্কার মুসীবত দূর না করার কারণে। সুতরাং তার জন্য দো‘আ কবূলের চেয়ে মহান জিনিস তার জন্য কিয়ামতের দিন সঞ্চয় করে রাখা হবে।

মানুষের উচিৎ হলো দো‘আর ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়া না করা। কেননা তাড়াহুড়া করা দো‘আ কবূল না হওয়ার অন্যতম কারণ। হাদীসে এসেছে,

«يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا كَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ ودَعَوْتُ وَ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»

“তোমাদের কেউ দো‘আয় তাড়াহুড়া না করলে তার দো‘আ কবূল হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে তাড়াহুড়া করা হয়ে থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দা বলে থাকে কত

দো‘আ করলাম, কত দো‘আ করলাম, কত দো‘আ করলাম, কিন্তু কবূল তো হচ্ছে না।”[37] তাই কারও জন্য দো‘আতে তাড়াহুড়া এবং দো‘আ করতে করতে ক্লান্তি বোধ করে দো‘আ করা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়; বরং বেশি বেশি দো‘আ করা উচিৎ। কারণ, দো‘আ একটি ইবাদাত। দীনী ভাই! ছোট-বড় এবং কঠিন-সহজ সকল বিষয়ে আপনাকে বেশি বেশি দো‘আ করার উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

[37] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুদ দাওয়াত

ইবাদতে ইখলাছ এবং জান্নাত লাভের কামনা

প্রশ্ন: (২১) ইখলাছ অর্থ কী? কোনো মানুষ যদি ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তার বিধান কী?

উত্তর: বান্দা তার আমলের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য কামনা করবে এবং জান্নাতে পৌঁছার চেষ্টা করবে।

আর যদি বান্দা তার আমলে অন্য কিছুর নিয়ত করে, তবে তাতে নিম্ন লিখিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

১) যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্যের নৈকট্য লাভের নিয়ত করে এবং ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এটা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ বলেন,

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

"আমি সমস্ত শরীকদের চেয়ে শির্ক থেকে অধিক মুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যাতে সে আমার সাথে অন্য কোনো কাউকে শরীক করল, আমি তাকে এবং সে যা শরীক করল, তাকে প্রত্যাখ্যান করব।"[38]

---

[38] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকায়েক।

২) যদি আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের নিয়ত করে যেমন, নেতৃত্ব লাভ, সম্মান লাভ ইত্যাদি তাহলে তার আমল বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরণের আমল তাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ۝١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝١٦﴾ [هود: ١٥، ١٦]

"যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, হয় আমরা তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক যাদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬]

প্রথম প্রকার শির্ক এবং এ প্রকার শির্কের মাঝে পার্থক্য এ যে, প্রথম লোকটি আল্লাহর ইবাদাতকাvরী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করেছে। আর দ্বিতীয় লোকটি আল্লাহর ইবাদাতকারী হিসেবে মানুষের প্রশংসা অর্জনের নিয়ত করে নি। মানুষের প্রশংসার প্রতি তার কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই।

৩) আমল শুরু করার সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করেছে; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ এমনিতেই চলে আসার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, পবিত্রতা

অর্জনের মাধ্যমে ইবাদাতের নিয়তের সাথে সাথে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নিয়ত করা, সালাতের মাধ্যমে শরীর চর্চার নিয়ত করা, সাওমের মাধ্যমে শরীরের ওজন কমানো ও চর্বি দূর করা এবং হজের মাধ্যমে পবিত্র স্থান এবং হাজীদেরকে দেখার নিয়ত করা। এ রকম করাতে ইবাদাতে ইখলাছের ছাওয়াব কমে যাবে। আর যদি ইবাদাতের নিয়তটাই প্রবল হয়, তা হলে পরিপূর্ণ প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। আর ঐ পরিমাণ মিশ্রিত নিয়ত তার কোনো ক্ষতি করবে না- মিথ্যা ও গুনাহ করার দ্বারা যেমন হয়। হজের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْۚ﴾ [البقرة: ١٩٨]

"তোমাদের ওপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোনো পাপ নেই।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৮]

আর যদি ইবাদাতের নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো নিয়ত প্রবল থাকে তাহলে দুনিয়াতে যা অর্জন করল ছাওয়াব হিসেবে কেবল তাই পাবে, পরকালে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এ রকম করার কারণে সে ব্যক্তি পাপী হওয়ার আশংকা রয়েছে। কেননা সে আল্লাহর ইবাদাতের মাধ্যমে দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থের নিয়ত করেছে। এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۝٥٨﴾ [التوبة: ٥٨]

"তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা সাদকা বন্টনে আপনাকে দোষারোপ করে। সদকা থেকে কিছু পেলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৮]

আবু দাউদ শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোনো লোক যদি দুনিয়ার কোনো সম্পদ লাভের আশায় জিহাদে যায় তবে তার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। লোকটি কয়েকবার প্রশ্ন করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই বললেন, সে ব্যক্তি ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করবে অথবা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত তার নিয়ত অনুযায়ীই হবে।"[39]

[39] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবু বাদউল অহী; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ইমারাত।

আর যদি তার কাছে উভয়টি সমান হয় অর্থাৎ ইবাদাতের নিয়ত কিংবা অন্য কোনো নিয়তের কোনোটিই প্রবল না হয়, তাহলেও বিশুদ্ধ কথা হলো সে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এবং অন্যের জন্য ইবাদাত করলে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

মোটকথা অন্তরের নিয়তের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বান্দা কখনো সিদ্দীকীনের স্তরে পৌঁছে যায় আবার কখনো নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ জন্যই কোনো কোনো সালাফে সালেহীন বলেছেন, এখলাছের ব্যাপারে আমি যতটুকু নাফসের সাথে জিহাদ করেছি, অন্য কোনো ব্যাপারে আমার নাফসের সাথে ততটুকু জিহাদ করি নি।

আমরা আল্লাহর কাছে নিয়ত ও আমলে ইখলাস কামনা করি।

প্রশ্ন: (২২) আশা এবং ভয়ের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতামত কী?

উত্তর: মানুষ আশাকে ভয়ের উপর প্রাধান্য দিবে? না ভয়কে আশার ওপর? এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. বলেছেন, মানুষের নিকট আশা এবং ভয় সমান সমান হওয়া উচিৎ। একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ নয়। তিনি আরো বলেন, একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য দিলে বিপথগামী হবে। কেননা আশাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ আল্লাহর পাকড়াও

থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করবে। আর ভয়কে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে।

কোনো কোন আলিম বলেন, সৎ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশাকে প্রাধান্য দিবে এবং পাপ কাজের প্রতি ধাবিত হওয়ার সময় আল্লাহর ভয়কে সামনে রাখবে। কেননা বান্দা আনুগত্যের কাজের দ্বারা আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা আবশ্যক হওয়ার কাজ করে থাকে। তাই আশার দিককে অর্থাৎ আমলটি প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। আর মনের ভিতরে যদি পাপ কাজের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। যাতে পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

কিছু কিছু আলিম বলেছেন, সুস্থ ব্যক্তির ভয়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ। আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আশার আলো থাকা দরকার। কেননা সুস্থ ব্যক্তির নিকটে ভয় বেশি থাকলে পাপের কাজে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর রোগী ব্যক্তি আশাকে প্রাধান্য দিবে। কারণ, সে যদি আশাকে প্রাধান্য দেয়, তা হলে আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা রাখা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

এ মাসআলাতে আমার কাছে গ্রহণ যোগ্য কথা হলো মানুষের অবস্থাভেদে হুকুম বিভিন্ন হবে। ভয়ের দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে যদি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে মন থেকে এ ধরণের ভয় দূর করে দিয়ে আশার দিককে স্থান দিবে। আর যদি আশঙ্কা থাকে যে, আশার দিককে প্রাধান্য দিতে গেলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবার ভয় রয়েছে, তা হলে ভয়কেই প্রাধান্য দিবে।

মানুষ তার অন্তরের ডাক্তার। যদি তার অন্তর জীবিত থাকে। আর যদি অন্তর মৃত হয়ে থাকে, তা হলে তার কোনো চিকিৎসা নেই।

উপায় গ্রহণ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়

প্রশ্ন: (২৩) উপায় গ্রহণ করা কি আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিপন্থী উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় কেউ কেউ উপায় অবলম্বন করেছে। আবার কতক লোক এ বলে উপায় অবলম্বন করা বাদ দিয়েছে যে, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম -এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: মুমিনের ওপর কর্তব্য হলো অন্তরকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখা এবং কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ দূর করণে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। কেননা আকাশ-জমিনের চাবি কাঠি আল্লাহর হাতে। তাঁর হাতেই মানুষের সকল বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝١٢٣﴾ [هود: ١٢٣]

"আল্লাহর নিকটেই আছে আকাশ ও জমিনের গোপন তথ্য, আর প্রত্যেকটি বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে তাঁরই দিকে। অতএব, তাঁর-ই বন্দেগী কর এবং তাঁর-ই ওপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার রব বে-খবর নন।" [সূরা হূদ, আয়াত: ১২৩]

মূসা আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوۡمِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيۡهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ۝٨٤ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡنَا رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةٗ لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٨٥ وَنَجِّنَا بِرَحۡمَتِكَ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٨٦﴾ [يونس: ٨٤، ٨٦]

"আর মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাক, তবে তার-ই ওপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব, আমাদেরকে এ যালেম সম্প্রদায়ের ফিতনার বিষয়ে পরিণত করো না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে এ কাফিরদের কবল হতে উদ্ধার করুন"। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪-৮৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ﴾ [ال عمران: ١٦٠]

"মুমিনদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا﴾ [الطلاق: ٣]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন"। [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ৩]

সুতরাং বান্দার ওপর আবশ্যক হলো তার মালিক এবং আকাশ-জমিনের মালিকের ওপর ভরসা করবে এবং তাঁর প্রতি ভালো ধারণা রাখবে। সাথে সাথে বাহ্যিক উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে এবং আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা কল্যাণ সংগ্রহের উপকরণ গ্রহণ করা এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার উপায় অবলম্ভন করা আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর ওপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। দেখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে তিনি সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পাঠ করার মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য শরীরে ফুঁক দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আঘাত থেকে শরীর হিফাযত করার জন্য লোহার পোষাক পরিধান করতেন। যখন মুশরিক সম্প্রদায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য তার চারপাশে একত্রিত হলো, তখন মদীনাকে সংরক্ষণ করার জন্য তার চতুর্পার্শ্বে খন্দক খনন করেছেন। যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত হাতিয়ার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী দাউদ আলাইহিস সালামের সম্পর্কে বলেন,

﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ ٨٠﴾ [الانبياء: ٨٠]

“আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব, তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? [সূরা

আম্বিয়া, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ তা'আলা দাউদ আলাইহিস সালামকে ভালোভাবে যুদ্ধের বর্ম তৈরি করার আদেশ দিয়েছেন এবং তা লম্বা করে তৈরি করতে বলেছেন। কারণ, আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক শক্তিশালী।

উপরের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, যুদ্ধের স্থানের কাছাকাছি অঞ্চলের লোকদের জন্য ক্ষতিকারক গ্যাস শরীরে প্রবেশের ভয় থাকলে তারা যদি উপযুক্ত পোষাক পরিধান করে, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এ সমস্ত উপকরণ শরীরকে হিফাযত করবে। এমনিভাবে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখাতেও কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যদি প্রয়োজনের সময় এগুলো না পাওয়ার ভয় থাকে। সর্বোপুরি ভরসা থাকবে আল্লাহর ওপর। তা'আলা এ সমস্ত আসবাব[40] গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন তাই এ সমস্ত আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা বৈধ। এ জন্য নয় যে, এগুলোর ভিতরে কল্যাণ-অকল্যাণ বয়ে আনার ক্ষমতা আছে।

পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসমস্ত নি'আমত সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এ যে, তিনি যেন আমাদের সকলকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের ও আমাদের মুমিন ভাইদেরকে তাঁর প্রতি

---

[40] জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র এবং বিপদাপদ হতে উদ্ধারের জন্য যেসমস্ত উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা দরকার, তাকে সবাব বা আসবাব বলা হয়ে থাকে।

জন্য ঈমান এবং তাঁর ওপর ভরসার বলে বলিয়ান করেন এবং এমন সব উপায় উপকরণ গ্রহণ সহজ করেন যা তাঁর পক্ষ থেকে অনুমদিত ও মনোনিত।

প্রশ্ন: (২৪) ইসলামে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার হুকুম কী?

উত্তর: উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা কয়েক প্রকার হতে পারে:

১) যা মূলতই তাওহীদের পরিপন্থী। তা এই যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করল, বাস্তবে যার কোনো প্রভাবই নেই। মুসিবতে পড়ে কবর পূজারীরা এমনটি করে থাকে। এটি বড় শির্ক। যারা এ ধরণের শির্কে লিপ্ত হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

২) শরী'আত সম্মত উপায়-উপকরণের ওপর ভরসা করা এবং আল্লাহ তা'আলাই যে এগুলোর সৃষ্টিকারী, তা একেবারে ভুলে যাওয়া। এটাও এক প্রকার শির্ক। তাবে এটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

(৩) মানুষ উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, এ উপকরণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনি ইচ্ছা করলে এটি ছিন্ন করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট রাখতে পারেন। এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোনভাবেই তাওহীদের পরিপন্থী নয়।

মোটকথা এ যে, শরী'আত সম্মত উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকা সত্বেও এগুলোর উপর পরিপূর্ণরূপে ভরসা করা ঠিক নয়। বরং সম্পূর্ণরূপে ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপরই করতে হবে। সুতরাং কোনো চাকরীজীবি যদি তার বেতনের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী আল্লাহর ওপর ভরসা করতে ভুলে যায়, তাহলে সে এক প্রকার শির্কে লিপ্ত হবে। আর যে কর্মচারী এ বিশ্বাস রাখে যে, বেতন কেবল একটি মাধ্যম মাত্র তাহলে এটা আল্লাহর ওপর ভরসার বিরোধী হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর ওপর ভরসা করার সাথে সাথে আসবাব গ্রহণ করতেন

প্রশ্ন: (২৫) ঝাড়-ফুঁকের হুকুম কী? কুরআনের আয়াত লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার হুকুম কী?

উত্তর: জাদু বা অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যদি তা কুরআনের আয়াত বা অন্য কোনো বৈধ দো'আর মাধ্যমে হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সাহাবীগণকে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঝাড়-ফুঁকের বিভিন্ন দো'আও

প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি দো'আ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

«رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ»

"হে আমাদের রব! আপনার নাম অতি পবিত্র। আকাশ এবং জমিনে আপনার আদেশ বাস্তবায়িত হয়। আকাশে যেমন আপনার রহমত বিস্তৃত রয়েছে, জমিনেও অনুরূপভাবে আপনার রহমত বিস্তার করুন। আপনি আমাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন। আপনি পবিত্রদের প্রভু, এ রোগীর ওপর আপনার রহমত ও শিফা অবতীর্ণ করুন। এ ভাবে ঝাড়-ফুঁক করলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠত।"[41]

«بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

"আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। প্রতিটি এমন রোগ আরোগ্যের জন্যে, যা তোমাকে কষ্ট দেয়। প্রতিটি মানুষের অকল্যাণ থেকে এবং হিংসুকের বদ নজর থেকে আল্লাহ তোমাকে শিফা দান করুন। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।"[42]

«أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»

---

[41] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত তিবব।

[42] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস্ সালাম।

“আমি আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের উসীলায় আমার কাছে উপস্থিত ও আশংকিতকারী অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”।[43]

রোগী ব্যক্তি শরীরের যেখানে ব্যথা অনুভব করবে, সেখানে হাত রেখে উপরোক্ত দো‘আটি পাঠ করবে। উপরের দো‘আগুলো ছাড়াও হাদীসে আরো অনেক দো‘আ বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনের আয়াত অথবা হাদীসে বর্ণিত দো‘আ বা যিকির লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে আলোমেগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন বৈধ। আবার কেউ বলেছেন অবৈধ, তবে অবৈধ হওয়াটাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। কারণ, এসব ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটাই সর্বাধিক সঠিক কথা; বরং এ কাজটি একটি শির্কী কাজ বলে গণ্য হবে। কারণ, এখানে এমন জিনিসকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহ যাকে শরী‘আত সম্মত মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো দলীল পাওয়া যায়না। কুরআন বা অন্য দো‘আ পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁক দেওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রোগীর গলায় বা হাতে কুরআনের আয়াত লিখে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা কুরআনের আয়াত লিখে বালিশের নিচে রেখে দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।

প্রশ্ন: (২৬) ঝাড়-ফুঁক করা কি আল্লাহর ওপর (তাওয়াক্কুল) ভরসা করার পরিপন্থী?

---

[43] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস সালাম।

উত্তর: তাওয়াক্কুল অর্থ হলো কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং তাঁর ওপর নির্ভর করা। চেষ্টা করা বাদ দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের মাঝে সব চেয়ে বেশি আল্লাহর ওপর ভরসাকারী কে? তবে উত্তর হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি কি ক্ষতি ও অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতেন না? উত্তর হলো হ্যাঁ অবশ্যই করতেন। তিনি যখন যুদ্ধে বের হতেন, তখন তীর-তরবারীর আঘাত হতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের পোষাক পরিধান করতেন। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি দু'টি লোহার বর্ম পরে বের হয়েছেন। সম্ভাব্য বিপদাপদ হতে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। -ফুঁক করা বা অন্যান্য অসুস্থ ভাইদের ঝাড়-ফুঁক করা তাওয়াক্কুলের[44] পরিপন্থী নয়। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আ-ফালাক ও নাস পড়ে নিজের উপর এবং সাহাবীগণের উপর ফুঁক দিতেন।

প্রশ্ন: (২৭) তাবীজ ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর: তাবীজ ব্যবহার দু'ধরণের হতে পারে।

---

[44] আল্লাহর ওপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়।

প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজে ভর্তি করে ব্যবহার করা। কুরআনের আয়াত লিখে তাবীজ ব্যবহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কুরআন পড়ে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে।

দ্বিতীয়ত: কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখা, যার অর্থ বোধগম্য নয়। এধরণের কিছু ব্যবহার করা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়। কেননা সে লিখিত বস্তুর অর্থ অবগত নয়। কিছু কবিরাজ রয়েছে, যারা অস্পষ্ট এবং দূর্বোধ্য ভাষায় লিখে থাকে। যা আপনার পক্ষে বুঝা বা পাঠ করা সম্ভব নয়। এ ধরণের তাবীজ লিখা ও ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম এবং শির্ক।

প্রশ্ন: (২৮) পানাহারের পাত্রে চিকিৎসা স্বরূপ আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের অন্য কোনো আয়াত লিখে রাখা জায়েয আছে কি?

উত্তর: জানা আবশ্যক যে, আল্লাহর কিতাবকে এত নিম্নস্তরে নামিয়ে আনা কোনো ক্রমেই জায়েয নয়। একজন মুমিন ব্যক্তি কুরআনের সব চেয়ে মহান আয়াতটি কীভাবে পানাহারের পাত্রে লিখে রাখতে পারে? যা ঘরের ভিতরে ফেলে রাখা হয়, শিশুরা তা নিয়ে খেলা-ধুলা করে থাকে। সুতরাং এ কাজটি বৈধ নয়। যার ঘরে পানাহারের পাত্রে এরকম কিছু লেখা আছে, তার উচিৎ এ আয়াতগুলো মুছে ফেলা। কারণ, এইভাবে কুরআনের আয়াত লিখে চিকিৎসা করার কথা সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়।

কোনো প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা

প্রশ্ন: (২৯) কোনো কোনো ইসলামী দেশে মাদরাসার ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হলো কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে ইবন তাইমিয়া ও তার ছাত্রদের মাদরাসা এবং আশ'আরীদের মাদরাসা, এ দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকে। এভাবে বিভক্ত করা কি সঠিক? যে সমস্ত আলিমরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে থাকে, তাদের ব্যাপারে একজন মুসলিমের অবস্থান কি রকম হওয়া দরকার?

উত্তর: যে ছাত্ররা এ শিক্ষা গ্রহণ করে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হলো কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন, অস্বীকার কিংবা দৃষ্টান্ত পেশ করা ছাড়াই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা। প্রকৃত পক্ষে এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি। এ মাযহাব তাদের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী এ মাযহাবই সত্য। সালাফে সালেহীনের বক্তব্যও তাই। সুস্থ বিবেক এ মাযহাবকেই সমর্থন করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জ্ঞানার্জনের মাদরাসাকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। একটি আল্লামা ইবন তাইমিয়া ও তাঁর ছাত্রদের মাদরাসা এবং অন্যটি আশআরী ও মাতুরিদীয়াদের মাদরাসা। ইবন তাইমিয়ার মাদরাসার ছাত্রগণ কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যকে তার বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করার বিরোধীতা করেন। আর আশআরী ও মাতুরিদীয়া ফিরকার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অপব্যাখ্যা করে থাকে।

সুতরাং আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয় মাদরাসার মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যত আয়াত ও হাদীস এসেছে, কোনো প্রকার পরিবর্তন করা ছাড়াই সেগুলোর ক্ষেত্রে ঈমান আনয়ন করে থাকেন। আর দ্বিতীয় মাদরাসার লোকেরা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে তার আসল অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। নিম্নের উদাহরণটির মাধ্যমে উভয় মাযহাবের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾ [المائدة: ٦٤]

"বরং তাঁর হাত দু'টি সদা প্রসারিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬৪]

ইবলীস যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদমকে সেজদা করতে

অস্বীকার করল তখন আল্লাহ তাকে ভৎর্সনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ [ص: ٧٥]

"আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'টি হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সাজদাহ করতে কিসে তোকে বারণ করল?" [সূরা সুয়াদ, আয়াত: ৭৫]

উপরে বর্ণিত দুই মাদরাসার শিক্ষকরা আল্লাহর দুই হাত দ্বারা কী উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। প্রথম মাদরাসার লোকেরা বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে যেরকম হাত প্রযোজ্য, আল্লাহর জন্য সেরকম হাতই সাব্যস্ত করতে হবে। আর দ্বিতীয় মাদরাসার ছাত্ররা বলে থাকে, হাতকে তার আসল অর্থে ব্যবহার করা যাবেনা। তাদের মতে আল্লাহর জন্য প্রকৃত হাত সাব্যস্ত করা হারাম। তাদের মতে হাতের উদ্দেশ্য হলো কুদরাত (শক্তি) অথবা নি'আমত।

সুতরাং উভয় মাযহাবের ভিতরে এতো পার্থক্য থাকা সত্বেও মাযহাব দু'টিকে একই কাতারে শামিল করা যায়না। উক্ত দু'মতের কোনো একটিকে বলতে হবে যে, তারা আহলে সুন্নাত বা সুন্নাতে উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যটিকে তা বলা যাবে না। এতদুভয়ের মধ্যে অবশ্যই ইনসাফের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। অতএব, তাদের মতামতগুলোকে ন্যায়ের মানদন্ডে মেপে দেখা কর্তব্য। আর সে ন্যায়ের মানদন্ডটি হলো আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সাহাবী, তাবেঈ

ও তাদের পূণ্যবান অনুসারী এবং মুসলিমদের ইমামগণের বক্তব্য। আতএব, উক্ত মানদণ্ডের পরিমাপ অনুযায়ী এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ইবন তাইমিয়া এবং তার ছাত্রদের মাযহাবটি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালেহীনদের মাযহাবের অনুরূপ। পক্ষান্তরে আশআরী সম্প্রদায়ের মাযহাব কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফে সালেহীনদের মাযহাবের পরিপন্থী। তারা বলে থাকেন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পন্ন আয়াতগুলোকে যদি এমন অর্থের মাধ্যমে তাবীল (অপব্যাখ্যা) করা হয়, যাতে অন্য কোনো দলীলের বিরোধীতা হবে না, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

আমরা তাদের উত্তরে বলব যে, কুরআনের কোনো শব্দকে বিনা দলীলে প্রকাশ্য অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে ব্যবহার করাই কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতা করার নামান্তর এবং আল্লাহ সম্পর্কে বিনা দলীলে কথা বলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলা হারাম। আল্লাহ তায়া,লা বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣﴾ [الاعراف: ٣٣]

“আপনি বলে দিন, আমার রব কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়, অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার পক্ষে

কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলাও হারাম, যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦﴾ [الاسراء: ٣٦]

“যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তর এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে”। [সূরা ইসরা, আয়াত: ৩৬] যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অপব্যাখ্যা করে, তাদের কাছে শরী‘আতের কোনো জ্ঞান নেই। এমন কি তারা সুস্থ বিবেক সম্পন্নও নয়।

বলা হয় যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. নিম্ন লিখিত তিনটি স্থানে তাবীল করেছেন:

(১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে”

(২) হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত এবং

(৩) আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤] “তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪]

উত্তরে আমরা বলব যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল থেকে এধরণের কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, আবু হামেদ ইমাম গাজালী আহমাদ ইবন হাম্বলের নামে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাত্র তিনটি স্থানে তাবীল করেছেন। স্থান তিনটি হলো, "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত", "বনী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে" এবং "আমি যেন ইয়ামানের দিক থেকে আল্লাহর নিঃশ্বাস পাচ্ছি"। এ ধরণের কথা সম্পূর্ণ বানোয়াট।

আর আল্লাহর বাণী, ﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤] "তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৪] আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. এ আয়াতটির তাবীল করেন নি; বরং তিনি আয়াত থেকে সাব্যস্ত কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি জাহমিয়্যাহ ফিরকার প্রতিবাদে আল্লাহর ইলমকে সাব্যস্ত করেছেন। জাহমিয়্যাহ ফিরকার লোকেরা বলে আল্লাহ যদি সর্বত্র থাকেন, তাহলে আল্লাহ স্বশরীরে থাকা আবশ্যক হয়। এ জন্যই তারা উক্ত আয়াতের উল্টা ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা বলি যে, আল্লাহ সাথে আছেন এ কথার অর্থ হলো জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত মাখলুকাতকে বেষ্টন করে আছেন। এটা নয় যে, সৃষ্টিকুলের সাথে মিশে আছেন। সাথে থাকার অর্থ স্থানভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে, সে আমাকে দুধের সাথে পানি পান করিয়েছে, আমি জামা'আতের সাথেই সালাত আদায় করেছি, তার স্ত্রী তার সাথে আছে।

উপরের উদাহরণ গুলোর প্রথম উদাহরণে দুধের সাথে পানির সংমিশ্রন বুঝায়। দ্বিতীয় উদাহরণে একে অপরের সাথে মিশে যাওয়া ব্যতীত একই স্থানে এক সাথে কাজ করা বুঝায় এবং তৃতীয় উদাহরণে সাথে থাকার অর্থ একই স্থানে বা একই কাজে থাকাকে আবশ্যক করে না। সুতরাং আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন- একথার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ বান্দার সাথে মিশে আছেন অথবা একই স্থানে আছেন। এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, আল্লাহ রয়েছেন সমস্ত মাখলুকাতের উপরে। আল্লাহ আমাদের সাথে থাকার অর্থ এ যে, তিনি সাত আকাশের উপরে ‘আরশে আযীমে থেকেও শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান, রাজত্ব, শ্রবণ, দেখা এবং পরিচালনার মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে বেষ্টন করে আছেন। সুতরাং সাথে থাকাকে কোনো ব্যাখ্যাকারী যদি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, তাহলে আয়াতের দাবী থেকে বের হয়ে আসবে না এবং সে অপব্যাখ্যাকারীও হবে না। তবে যে ব্যক্তি সাথে থাকাকে একসাথে সর্বস্থানে, সবসময় বিরাজমান থাকা বুঝবে সে অপব্যাখ্যাকারী হিসাবে গণ্য হবে।

সমস্ত বানী আদমের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে, যেভাবে ইচ্ছা তিনি তা ঘুরান- হাদীসটি মুসলিম শরীফে রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের লোকেরা এ হাদীসের অপ ব্যাখ্যা করেন নি। তারা আল্লাহর শানে যে ধরণের আঙ্গুল প্রযোজ্য তা সাব্যস্ত করেন। এ কথার অর্থ এ নয় যে, আমাদের অন্তরগুলো আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে লেগে আছে। মেঘমালা আকাশ এবং যমিনের মাঝখানে থাকে কিন্তু তা

আকাশের সাথে মিশে থাকেনা, যমিনের সাথেও নয়। তাই বানী আদমের অন্তর আল্লাহর আঙ্গুলের সাথে মিশে থাকা জরুরি নয়।

হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত, যে তাতে স্পর্শ করল অথবা চুম্বন করল, সে যেন আল্লাহর হাতে স্পর্শ করল বা চুম্বন করল, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম ইবন তাইমীয়া রহ. মাজমূ ইবন কাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়; বরং এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কথা হলো এটি ইবন আববাসের নিজস্ব উক্তি। উপরোক্ত গ্রন্থে (৪৪/৩) সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজরে আসওয়াদ আল্লাহর কোনো গুণ নয় বা তাঁর ডান হাতও নয়। যেহেতু বলা হয়েছে "পৃথিবীতে তাঁর ডান হাত" শুধু ডান হাত বলা হয় নি। সাধারণ অর্থ থেকে আলাদা হবে। তাই হাজরে আসওয়াদকে আল্লাহর ডান হাত বলা যাবেনা। সুতরাং তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা করার প্রশ্নই আসে না।

সহীহ আকীদা ও ইলম শিক্ষার মাদরাসাকে ইবন তাইমিয়ার মাদরাসা হিসাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। কারণ, তিনি নতুন কোনো মাদরাসা তৈরি করেন নি। তিনি সালাফে সালেহীনের পথই অনুসরণ করেছেন।

যারা আল্লাহর গুণাবলী সম্বলিত আয়াতসমূকে ব্যাখ্যা করে, তাদের ব্যাপারে আমরা বলব যে, তাদের নিয়ত যদি ভালো হয় এবং দীনের প্রতি আনুগত্যশীল বলে জানা যায়, তবে তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে; কিন্তু তার কথা যে সালাফে সালেহীনের মাযহাব বিরোধী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তাঁরা সর্বক্ষেত্রে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ

গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর ঈমান এনেছেন। নিয়ত ভালো থাকা সত্বেও কোনো মানুষ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, তবে তাকে তিরস্কার করা যাবে না; বরং এতে সে ইজতিহাদের ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

"বিচারক যদি ইজতিহাদ করে সঠিক ফায়সালা দেয়, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে, আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়সালা দিতে গিয়ে ভুল করে, তাহলে তার জন্য একটি পুরস্কার রয়েছে"।

কাজেই আকীদার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে যারা ভুল করেছেন, তাদেরকে গোমরাহ বলা যাবে না। বিশেষ করে যখন জানা যাবে যে, তার নিয়ত ভালো ছিল, সে দীনের প্রতি আনুগত্যশীল ছিল এবং সে সুন্নাহর অনুসরণকারী ছিল। অবশ্য তার মতামতকে গোমরাহী মতামত বলতে কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা

প্রশ্ন: (৩০) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা কী? নাম ও গুণের মধ্যে পার্থক্য কী? আল্লাহর প্রতিটি নাম কি একটি করে গুণকে আবশ্যক করে? অনুরূপভাবে সিফাতও কি নামকে আবশ্যক করে?

উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা হলো আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, কোনো প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকার, ধরণ বর্ণনা এবং উপমা পেশ করা ছাড়াই তার ওপর বিশ্বাস করা। নাম ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, নাম হলো আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেছেন এবং গুণ হলো আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আল্লাহর প্রতিটি নাম একটি করে গুণকে আবশ্যক করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨٢]

“নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮২]

এখানে (গাফুর) আল্লাহর একটি নাম। অর্থ ক্ষমাশীল। এ নামটির

মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা করা গুণ প্রমাণিত হয়। অনুরূপ ভাবে (রাহীম) নামটি রাহমত গুণটিকে আবশ্যক করে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যেসমস্ত গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন, তা থেকে নাম নির্বাচন করা আবশ্যক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কথা বলা আল্লাহর একটি গুণ। এ থেকে মুতাকাল্লিম (বক্তা) নাম বের করা বৈধ নয়। সুতরাং নামের তুলনায় গুণ অধিক প্রশস্ত। কারণ, প্রতিটি নামই একটি করে সিফাতকে সাব্যস্ত করে। কিন্তু প্রতিটি ছিফাতের ক্ষেত্রে এমনটি নয়।

প্রশ্ন: (৩১) আল্লাহর নাম কি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত?

উত্তর: আল্লাহর নামগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়। সহীহ হাদীসে এর দলীল হলো,

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»

“হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর সন্তান। আমার কপাল আপনার হাতে। আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আপনার ফায়সালাই ন্যায় সম্মত। আপনার প্রতিটি নামের উসীলা দিয়ে আপনার কাছে দো'আ করছি। যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নাম কারণ করেছেন বা আপনার কোনো সৃষ্টিকে (বান্দাকে) শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন

অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন”।[45]

আর এ কথা শতসিদ্ধ যে, আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডারে যে সমস্ত নাম সংরক্ষিত রেখেছেন, তা একমাত্র আল্লহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যা অজ্ঞাত তা সীমিত হতে পারে না।

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[46]

হাদীসে এটা বুঝা যাচ্ছে না যে, আল্লাহর নাম মাত্র নিরানব্বইটি; বরং হাদীসের অর্থ এই যে, আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে এমন নিরানববইটি নাম রয়েছে, যা মুখস্ত করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। এতে বুঝা যায় যে, এ নিরানববইটি ব্যতীত আল্লাহর আরো নাম রয়েছে। এখানে (مَنْ أَحْصَاهَا) বাক্যটি পূর্বের বাক্যের পরিপূরক। নতুন বাক্য নয়। যেমন, আরবরা বলে থাকে আমার এমন একশটি ঘোড়া রয়েছে, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, তার কাছে ঘোড়ার সংখ্যা মাত্র একশটি; বরং তার কাছে এমন একশটি ঘোড়া আছে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। অন্য কাজের জন্য আরো ঘোড়া থাকতে পারে।

---

[45] মুনাদে আহমাদ

[46] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুশ শুরূত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. এ মর্মে হাদীস বিশারদগণের ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহর নামসমূহের নির্দিষ্ট সংখ্যার বর্ণনা সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয় নি। তিনি সত্যই বলেছেন। এর প্রমাণ উলামাদের এতে বিরাট ধরণের ইখতেলাফ বিদ্যমান রয়েছে। কারণ, যারা তিরমিযীতে ৯৯টি নাম সম্বলিত হাদীসটিকে সহীহ বলার চেষ্টা করেছেন, তারা বলেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত বিরাট। কারণ, তা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে বলা হয়েছে। সাহাবীগণ এ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্ধারণ করতে বলবেন না -এটা হতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল যে, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই নির্ধারিত।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এটি আবশ্যক নয়। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যদি নির্ধারিত হত, তাহলে পরিস্কারভাবে নামগুলো জানা থাকত এবং বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উল্লেখ থাকত। কারণ, এটি এমন বিষয়, যা বর্ণনা এবং হিফাযত করার প্রয়োজন। সুতরাং কীভাবে তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত না হয়ে দূর্বল এবং পরস্পর বিরোধী সূত্রে বর্ণিত হতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামগুলো বিশেষ এক উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন নি। তাহলো মানুষ যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত হতে খোঁজে বের করে। এতে করেই সৎকাজের প্রতি কে প্রকৃত আগ্রহী এবং কে আগ্রহী নয়, তা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

আল্লাহর নামগুলো শুধু কাগজে লিখে মুখস্ত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো:

1) ভালোভাবে নামগুলো মুখস্থ করা।
2) নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করা।
3) নামগুলোর দাবী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা। আর তা দু'ভাবে হতে পারে:

(ক) আল্লাহর নামসমূহের উসীলা দিয়ে তাঁর নিকট দো'আ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সেই নামগুলোর উসীলায় তাঁর কাছে দো'আ কর।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০]

আপনি যা কামনা করেন তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি নাম নির্বাচন করে সেই নামটি উল্লেখ করে দো'আ করবেন। যেমন, ক্ষমা চাওয়ার সময় আপনি বলবেন,يا غفور اغفر لى (ইয়া গাফুর! ইয়াগফিরলী) "হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন"। বলা কখনই উপযোগী নয় যে, يا شديد العقاب اغفرلى "হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে ক্ষমা করুন"। এটা এক ধরণের ঠাট্টা করার শামিল; বরং বলতে হবে, হে কঠোর শাস্তি দাতা! আমাকে আপনার শাস্তি হতে রেহাই দিন।

২) আপনার ইবাদাতে এমন কিছু থাকা চাই, যা আল্লাহর নামগুলোর দাবীকে আবশ্যক করে। রাহীম নামের দাবী হলো রহমত করা। সুতরাং

আপনি এমন আমল করবেন, যা আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কারণ হয়। এটাই আল্লাহর নামসমূহ মুখস্থ করার অর্থ। আল্লাহর নামসমূহের দাবীকে আবশ্যক করার মত আমলই জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উপরে আছেন –এ মর্মে একজন নারীর সাক্ষ্য

প্রশ্ন: (৩২) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে উপরে আছেন, সে ব্যাপারে সালাফদের মাযহাব কী? যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ছয়টি দিক থেকে মুক্ত এবং যে ব্যক্তি বলে যে, তিনি প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে আছেন, তার হুকুম কী?

উত্তর: সালফদের মাযহাব এ যে, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় মাখলুকাতের উপরে আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ﴾ [الشورا: ١٠]

"তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ কর, তার ফায়সালা আল্লাহর নিকটে।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১০]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٥١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخۡشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقۡهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ ٥٢﴾ [النور: ٥١، ٥٢]

"মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। মূলতঃ তারাই সফলকাম এবং যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫১-৫২]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا ٣٦﴾ [الاحزاب: ٣٦]

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করবে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হবে।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ٦٥﴾ [النساء: ٦٥]

"অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মেনে নেয়। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নেবে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫]

সুতরাং জানা গেল যে, মতভেদের সময় ঈমানদারের পথ হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফেরত যাওয়া এবং তাদের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা। সাথে সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের কথার বাইরে অন্য কারও কথা গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের কাছে কোনরূপ স্বাধীনতা না রাখা। এ ছাড়া কেউ ঈমানদার হতে পারবে না। পরিপূর্ণরূপে নিজেকে কুরআন ও সুন্নাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং অন্তর থেকে সংকীর্ণতা অবশ্যই দূর হতে হবে। এর বিপরীত করলে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء: ١١٥]

"হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে কেউ রাসূলের বিরোধীতা করবে এবং ঈমানদারদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলবে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ

করব। আর তা কতই না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫)]

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে থাকার মাসআলাটি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফেরানোর পর তা নিয়ে গবেষণাকারী অবশ্যই জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বসত্বায় সমস্ত মাখলুকাতের উপরে আছেন। বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়টি অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১) সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশের উপরে আছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ١٧﴾ [الملك: ١٧]

“তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার হাদীসে বলেন,

«رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ»

“আমাদের রব আল্লাহ। যিনি আকাশে আছেন।”[47]

তিনি আরো বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»

“ঐ সত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য ডাক দিলে স্ত্রী যদি বিছানায় যেতে অস্বীকার করে তাহলে যিনি আকাশে আছেন, স্বামী সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন।”[48]

২) আল্লাহ উপরে আছেন -এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦ﴾ [الانعام: ١٨]

“তিনিই মহাপ্রতাপশালী স্বীয় বান্দাদের উপরে আছেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৮]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوۡقِهِمۡ﴾ [النحل: ٥٠]

“তারা তাদের রবকে ভয় করে চলে। যিনি তাদের উপরে আছেন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫০]

---

[47] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত তিবব।

[48] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي»

“আল্লাহ তা‘আলা যখন সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর জয়লাভ করেছে। কিতাবটি তাঁর নিকটে ‘আরশের উপরে রয়েছে।”[49]

৩) আল্লাহর দিকে বিভিন্ন বিষয় উঠা এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। উপরের দিকে উঠা সব সময় নিচের দিক থেকেই হয়ে থাকে। এমনিভাবে অবতরণ করা সাধারণত উপরের দিক থেকে নিচের দিকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ﴾ [فاطر: ١٠]

“তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ উঠে থাকে এবং সৎ আমল তাকে উপরের দিকে তুলে নেয়।” [সূরা ফাতির, আয়াত: ১০]

আল্লাহ বলেন,

﴿تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: ٤]

“ফিরিশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তা‘আলার দিকে উর্ধ্বগামী হয়।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ৪]

---

[49] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবু বাদইল খালক (সৃষ্টির সূচনা)।

আল্লাহ বলেন,

﴿يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ﴾ [السجدة: ٥]

“তিনি আকাশে থেকেই জমিনে সকল কর্ম পরিচালনা করেন।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৫]

আল্লাহর বাণী,

﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢﴾ [فصلت: ٤٢]

“এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪২]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]

“আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে যাতে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬]

(কুরআন) যেহেতু আল্লাহর কালাম এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তাই এর দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন স্বীয় সত্বায় উপরে রয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»

“আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদিন রাত্রের একতৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন কে আছে আমার কাছে দো‘আ করবে? আমি তার দো‘আ কবূল করব। কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে প্রদান করবো। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত আছি।”[50]

বারা ইবন আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিছানায় শয়নকালে পাঠ করার দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন। সেই দো‘আর মধ্যে এটাও আছে,

«آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ»

“আমি আপনার অবতারিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং আপনার প্রেরিত নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এ দো‘আ পাঠ করার পর যদি তুমি মারা যাও, তাহলে তুমি ফিতরাতের (ইসলামের) ওপর মারা যাবে।”[৫১]

---

[50] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুদ্ দাওয়াত।

[51] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুদ্ দাওয়াত।

৪) আল্লাহ তা‘আলা উপরে হওয়ার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١﴾ [الاعلا: ١]

“আপনি আপনার সর্বোচ্চ ও সর্বমহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।” [সূরা আল-‘আলা, আয়াত: ১]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“সেগুলোকে (ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডলকে) সংরক্ষণ করা তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

«سبحان ربي الأعلى»

“আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার সুমহান রবের।”[52]

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার মাঠে ভাষণ দেওয়ার সময় আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (ألا هل بلغت؟) “আমি কি

[52] - আবু দাউদ, কিতাবুছ্ সালাত।

তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছি?” উপস্থিত জনতা এক বাক্যে স্বীকার করল, হ্যাঁ আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (أَللّٰهُمَّ اشهد) “হে আল্লাহ! আপনি স্বাক্ষী থাকুন।” এ কথা বলতে বলতে তিনি উপরের দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতে লাগলেন এবং মানুষের দিকে তা নামাতে লাগলেন। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে যাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটিতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আকাশে। তা নাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের দিকে হাত উঠিয়ে ইশারা করা অনর্থক বলে সাব্যস্ত হবে।

৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক দাসীকে প্রশ্ন করেছেন, আল্লাহ কোথায়? দাসী বলল, আকাশে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ»

“তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার।”[53]

হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত মু‘আবিয়া ইবন হাকাম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় সত্বায় উপরে হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। কেননা (أين) শব্দটি দিয়ে কোনো বস্তুর অবস্থান সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হয়ে

---

[53] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল মাসাজিদ।

থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মহিলাটিকে আল্লাহ কোথায় -এ কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন মহিলাটি বলল, তিনি আকাশে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথাকে মেনে নিলেন এবং বললেন, এটাই ঈমানের পরিচয়। তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ, সে ঈমানদার। সুতরাং যতক্ষণ কোনো মানুষ আল্লাহ উপরে হওয়ার বিশ্বাস না করবে এবং এ কথার ঘোষণা না দিবে ততক্ষণ সে ঈমানদার হতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে হওয়ার ব্যাপারে কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে উপরোক্ত দলীলগুলো উল্লেখ করা হলো। যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত দলীলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সালাফে সালেহীন এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ স্বীয় সত্বায় মাখলুকের উপরে রয়েছেন। এমনিভাবে তারা আল্লাহর গুণাবলী সুউচ্চ হওয়ার ওপরও একমত হয়েছেন।

﴿وَلَهُ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧]

"আকাশ ও জমিনে সর্বোচ্চ মর্যদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামসমূহ। কাজেই সেই নামসমূহ ধরেই (অসীলায়) তাঁকে ডাক।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০]

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অবগত আছেন আর তোমরা অবগত নও।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৭৪]

﴿فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧٤﴾ [النحل: ٧٤]

“তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করোনা।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২]

এমনিভাবে আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সত্বা, গুণাগুণ এবং কর্মসমূহ পরিপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

অনুরূপভাবে কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীনের সর্বসম্মত ঐকমত্য, সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও[54] আল্লাহ উপরে হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়।

বিবেক এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, উচ্চে হওয়া একটি পরিপূর্ণ ও উত্তম গুণ। অপর পক্ষে উপরে হওয়ার বিপরীতে রয়েছে ত্রুটিপূর্ণ গুণ। আল্লাহর জন্য সকল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত। তাই আল্লাহর জন্য সুউচ্চে হওয়া বিবেক সম্মত। তাই উপরে হওয়াতে ত্রুটিপূর্ণ কোনো গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সুযোগ নেই। আমরা বলব যে, উপরে হওয়া সৃষ্টিজীব দ্বারা বেষ্টিত হওয়াকে আবশ্যক করে না। আর যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করবে, সে নিছক ধারণা করল এবং বিবেকভ্রষ্ট হিসাবে পরিগণিত হল।

---

[54] আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে যে সৃষ্টিগত স্বভাব এবং দীন ইসলাম কবুল করার যে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে ফিতরাত বলা হয়।

মানুষের স্বভাব জাত ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ মাখলুকের উপরে প্রমাণিত হয়। মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দো'আ করে, তখন অন্তরকে আকাশের দিকে ধাবিত করে। এ জন্যই মানুষ যখন আল্লাহর কাছে দো'আ করে তখন ফিতরাতের দাবী অনুযায়ী আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে। একদা হামদানী নামক জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবুল মা'আলী আল-জুওয়াইনীকে বলল, আপনি তো আল্লাহ উপরে হওয়াকে অস্বীকার করেন। আপনি আমাকে বলুন, আল্লাহ যদি উপরে না থাকেন, তা হলে আল্লাহ ভক্ত কোনো মানুষ যখনই আল্লাহর কাছে দো'আ করে, তখন তার অন্তরকে উপরের দিকে ফেরানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কেন? এ কথা শুনে জুওয়াইনী মাথায় হাত মারতে মারতে বলতে থাকল হামদানী আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছে! আমাকে হামদানী দিশেহারা করে দিয়েছে!

ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ঘটনার সূত্র সঠিক হোক কিংবা ভুল হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রতিটি ব্যক্তির অনুভূতিও হামদানীর মতোই। দো'আ করার সময় সবাই উপরের দিকে অন্তর ও হাত উঠানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ ও ধুলামলিন পোষাক নিয়ে অন্তত্য ব্যকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে

থাকে হে আমার প্রতিপালক! হে রব!! অথচ সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোষাক পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দো'আ কবূল হতে পারে ?[55] এমনিভাবে সালাতে বান্দা তার অন্তরকে আকাশের দিকে ফেরায়। বিশেষ করে সে যখন সাজদাহয় যায় তখন বলে, سبحان ربي الأعلى "আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমার সুউচ্চ প্রভুর"। মা'বূদ আকাশে তাই সে এভাবে বলে থাকে।

যারা আল্লাহ 'আরশের উপরে হওয়াকে অস্বীকার করে তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা ছয়টি দিক থেকে মুক্ত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট দিকে অবস্থান করেন না; বরং তিনি সর্বদিকে সর্বত্র সদা বিরাজিত। আমরা বলব এ কথাটি একটি বাতিল কথা। কেননা এটা এমন কথা যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্তকৃত বিষয়কে অস্বীকার করার নামান্তর। আর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য যে সমস্ত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, তাও বাতিল করার আহ্বান জানায়। তা এই যে, মহান আল্লাহ তা'আলা উপরের দিকে রয়েছেন। আল্লাহ উপরে আছেন এ কথা অস্বীকার করা হলে আল্লাহকে অস্তিত্বহীন বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়ে যায়। কেননা দিক হলো ছয়টি। উপর, নিচ, ডান, বাম, পশ্চাৎ এবং সম্মুখ। অস্তিত্ব সম্পন্ন যে কোনো বস্তুকে এ ছয়টি জিনিসের সাথে সম্পর্কিত রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবেক সম্মত ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ

55 সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুদ দাওয়াত।

তা'আলার ক্ষেত্রে যদি ছয়টি দিককে সমানভাবে অস্বীকার করা হয়, তা হলে আল্লাহ নেই এ কথাই আবশ্যক হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) কোনো মানুষের সুস্থ মস্তিস্ক এ ছয়টি দিকের বাইরে কোনো জিনিসের অস্তিত্বকে সম্ভব মনে করতে পারে কী? কেননা বাস্তবে আমরা এ ধরণের কোনো জিনিসের অস্তিত্ব খোঁজে পাই নি। আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ উপরে। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, সালাফে সালেহীনের ইজমা, সুস্থ বিবেক এবং ফিতরাতও তা সমর্থন করে। যেমন আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন; কিন্তু আল্লাহকে কোনো বস্তুই পরিবেষ্টন করতে পারে না। কোনো মুমিনের জন্যই এটা বৈধ নয় যে, সে মানুষের কথাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে মানুষটি যত বড়ই হোক না কেন। আমরা ইতিঃপূর্বে দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

যারা বলে আল্লাহ মুমিন ব্যক্তির অন্তরে আছেন, তাদের কথার পক্ষে আমাদের জানামতে কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালেহীনের কোনো উক্তি পাওয়া যায় না। কথাটির অর্থ যদি এ হয় যে, আল্লাহ বান্দার অন্তরে অবতীর্ণ হয়ে আছেন, তাহলে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোওয়াট। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে অনেক পবিত্র। বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, কীভাবে একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য মতে আল্লাহ তা'আলা আকাশে হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ তা'আলা মুমিনের অন্তরে থাকেন একথা মেনে নিতে পারে?! অথচ এর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর একটি দলীলও মিলে না।

আল্লাহ মুমিন বান্দার অন্তরে আছেন -এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, মুমিন ব্যক্তি সদা-সর্বদা অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে এ কথা সত্য। তবে বাক্যটি পরিবর্তন করা দরকার, যাতে বাতিল অর্থের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। এভাবে বলা উচিৎ যে, মুমিন বান্দার অন্তরে সবসময় আল্লাহর যিকির বিদ্যমান রয়েছে। তবে যারা এ কথা বলে তাদের কথা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ আকাশে আছেন এ কথাকে অস্বীকার করা এবং মুমিনের অন্তরে আল্লাহর অবস্থানকে সাব্যস্ত করা, অথচ এটা বাতিল।

সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফে সালেহীনের ইজমা বাদ দিয়ে এমন বাক্য ব্যবহার থেকে সাবধান থাকা উচিৎ, যা সত্য-মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। মুমিনদের উচিৎ প্রথম যুগের আনসার-মুহাজির সাহাবীদের পথ অনুসরণ করা। তবেই তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠]

“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা

থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান সফলতা।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর রহমত দান করুন। তিনিই মহান দাতা।

আল্লাহ তা‘আলা সুউচ্চ ‘আরশের উপরে আছেন

প্রশ্ন: (৩৩) আল্লাহ তা‘আলার শানে যেভাবে প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই ‘আরশের উপরে আছেন -এটাই কি সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা?

উত্তর: আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদা অনুযায়ী যেভাবে ‘আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভাপায়, তিনি সেভাবেই ‘আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুফাসসিরগণের ইমাম আল্লামা ইবন জারীর বলেন, ইসতিওয়া অর্থ হলো সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া। আল্লাহর বাণী, ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥] এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, “আল্লাহ ‘আরশের উপরে সমুন্নত।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫] এ অর্থ ব্যতীত সালাফে সালেহীন থেকে অন্য কোনো অর্থ বর্ণিত হয় নি।

১) অন্য কোনো শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে এককভাবে ব্যবহার হলে অর্থ হবে, পরিপূর্ণ হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسۡتَوَىٰٓ﴾ [القصص: ١٤]

“যখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন এবং পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন।” [সূরা আল-কসাস, আয়াত: ১৪]

২) ইসতিওয়া শব্দটি আরবী অক্ষর (واو) এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহার হলে অর্থ হবে সমান সমান হওয়া, একটি জিনিস অন্যটির বরাবর

হওয়া। যেমন, বলা হয় (استوى الماء والعتبة) পানি কাষ্ঠের সমান হয়ে গেছে।

৩) আরবী অব্যয় (إلى) এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, ইচ্ছা করা, মনোনিবেশ করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٢٩]

“অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯]

৪) আরবী অব্যয় (على) এর সাথে মিলিত হয়ে আসলে অর্থ হবে, সমুন্নত হওয়া, উপরে হওয়া। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥﴾ [طه: ٥]

“আল্লাহ ‘আরশের উপরে সমুন্নত।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৫]

আবার কোনো কোনো সালাফ বলেন ইসতিওয়া শব্দটি إلى এবং على এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটির সাথেই মিলিত হয়ে আসুক না কেন, অর্থের দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। একটি অন্যটির অর্থে ব্যবহার হয়। তাই উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ ‘আরশের উপর সমুন্নত।

‘আল্লাহ ‘আরশের উপরে সমুন্নত’ এ কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন: (৩৪) সম্মানিত শাইখ! আল্লাহ আপনাকে হিফাযত করুন! আপনি বলেছেন, ‘আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া বিশেষ এক ধরণের সমুন্নত হওয়া, যা কেবল আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে প্রযোজ্য। আমরা কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর: আমরা বলি যে, ‘আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি বিশেষ ধরণের সমুন্নত হওয়া। যা আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের উপরে হওয়ার সাথে ‘আরশের উপরে সমুন্নত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্যই এ রকম বলা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ মাখলুকাতের উপর সমুন্নত হলেন অথবা আকাশের উপরে কিংবা জমিনের উপরে। অথচ তিনি সকল বস্তুর উপরে। অন্যান্য মাখলুকাতের ক্ষেত্রে আমরা বলি আল্লাহ তা‘আলা আকাশ-জমিনসহ সকল মাখলুকের উপরে আছেন। আর ‘আরশের ক্ষেত্রে বলব যে, আল্লাহ ‘আরশের উপরে সমুন্নত (مستوي)। সুতরাং ইসতিওয়া (সমুন্নত হওয়া) গুণটি সাধারণভাবে উপরে হওয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ জন্যই ‘আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া গুণটি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা আল্লাহর কর্মগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর মাখলুকের উপরে হওয়া আল্লাহর সত্বার সাথে সম্পর্কিত গুণ, যা আল্লাহর সত্বা হতে কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লামা ইবন তাইমিয়া দুনিয়ার

আকাশে আল্লাহর অবতরণ সংক্রান্ত হাদীসে এরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছয়দিনে আকাশ-জমিন সৃষ্টি করার পর ‘আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। তার পূর্বে তিনি ‘আরশের উপরে ছিলেন না। ইসতিওয়া অর্থ বিশেষ এক ধরণের উপরে হওয়া। তাই কোনো বস্তু অন্য বস্তুর উপরে সমুন্নত হওয়ার অর্থ বস্তুটি তার উপরে আছে; কিন্তু উপরে থাকলেই সমুন্নত হওয়া জরুরি নয়। এজন্যই প্রতিটি উপরের বস্তুকে সমুন্নত বলা যায় না। তার বিপরীতে প্রতিটি সমুন্নত বস্তুই অপর বস্তুর উপরে বিরাজমান।

আমাদের কথা, আল্লাহর শানে যে ধরণের সমুন্নত হওয়া প্রযোজ্য তিনি সে রকমভাবেই ‘আরশে আযীমে সমুন্নত -এর অর্থ এই যে, ‘আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের মতোই। আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহর ক্ষমতা ও বড়ত্ব অনুযায়ী তাঁর সাথে প্রতিষ্ঠিত। ‘আরশের উপরে তাঁর সমুন্নত অন্য কোনো মাখলুকাতের সমুন্নত হওয়ার মত নয়। আল্লাহর সত্বা যেহেতু অন্য কোনো সত্বার মত নয়, তাই তাঁর সিফাতও অন্য কোনো সিফাতের মত নয়। বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

“তাঁর অনুরূপ কোনো কিছু নেই। তিনি সব কিছু দেখেন এবং শুনেন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহর সত্বার মত কোনো সত্বা নেই এবং আল্লাহর গুণাবলীর মতো কোনো গুণাবলীও নেই। একজন বিদ‘আতী লোক ইমাম মালেক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আল্লাহ ‘আরশের উপরে কি অবস্থায় সমুন্নত আছেন? উত্তরে মহামান্য ইমাম বললেন, ‘আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপরে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ‘আত।’ পরবর্তী বিদ্যানগণ সকল সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক রহ.-এর এ উক্তিটিকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

কখন ইনশাআল্লাহ বলতে হবে?

প্রশ্ন: (৩৫) কোন ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে হবে না?

উত্তর: ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা উত্তম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيۡءٍ إِنِّي فَاعِلٞ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣﴾ [الكهف: ٢٣]

“কখনই তুমি কোনো বিষয়ে বলোনা, আমি ওটা আগামীকাল করবো। তবে এভাবে বলবে যে, যদি আল্লাহ চান।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ২৩-২৪]

অতীত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। যেমন, কোনো লোক যদি বলে গত রবিবারে রামাযান মাস এসেছে ইনশাআল্লাহ। এখানে ইনশাআল্লাহ বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা অতীত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ইনশাআল্লাহ আমি কাপড় পরিধান করেছি। এখানেও ইনশাআল্লাহ বলার দরকার নেই। কারণ, কাপড় পরিধান করা শেষ হয়ে গেছে। সালাত আদায় করার পর ইনশাআল্লাহ সালাত পড়েছি বলার দরকার নেই; কিন্তু যদি বলে ইনশাআল্লাহ মাকবূল সালাত পড়েছি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, সালাত কবূল হলো কি না তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

প্রশ্ন: (৩৬) ইরাদাহ বা আল্লাহর ইচ্ছা কত প্রকার?

উত্তর: ইরাদাহ (ইচ্ছা) দু’প্রকার

1) ইরাদাহ কাওনীয়া (সৃষ্টি গত ইচ্ছা)
2) ইরাদা শারঈয়া (শরী‘আত গত ইচ্ছা)

আল্লাহর যে ইচ্ছা সৃষ্টি করার সাথে সম্পৃক্ত তাই ইরাদাহ কাওনীয়া। আর যে ইচ্ছা ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত তাকে ইরাদাহ শারঈয়া বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কোনো জিনিসকে ভালোবেসে যে ইচ্ছা পোষাণ করেন তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। ইরাদাহ শরঈয়ার উদাহরণ হলো, আল্লাহর বাণী

﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [النساء: ٢٧]

“আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৭]

এখানে ইচ্ছা করেন অর্থ ভালোবাসেন। এখানে সৃষ্টিগত ইচ্ছা অর্থে ব্যবহার হয় নি; বরং ব্যবহৃত হয়েছে শরী‘আতগত ইচ্ছায়। যদি সৃষ্টিগত অর্থে হত তাহলে সকল মানুষকে ক্ষমা করে দিতেন; কিন্তু তা তো করেন নি। কেননা অধিকাংশ বনী আদমই কাফির। সুতরাং আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন অর্থ আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করা পছন্দ করেন। আল্লাহ কোনো জিনিসকে ভালোবাসার অর্থ এই নয়

যে, তা অবশ্যই কার্যকরী হবে। তা কার্যকরী না হওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য রয়েছে।

ইরাদাহ কাওনীয়া তথা সৃষ্টির সাথে সংলিষ্ট ইচ্ছার দৃষ্টান্ত হলো,

﴿إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغۡوِيَكُمۡۚ﴾ [هود: ٣٤]

“যদি আল্লাহই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৩৪]

এখানে যে ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, তাতে আল্লাহর ভালোবাসা থাকা জরুরি নয়।

যদি বলা হয় কার্যকরী হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে ইরাদাহ কাওনীয়া এবং ইরাদাহ শরঈয়ার মধ্যে পার্থক্য কী? উত্তরে আমরা বলব যে, ইরাদাহ কাওনীয়াতে উদ্দিষ্ট বস্তু অবশ্যই কার্যকরী হবে। আল্লাহ কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে চাইলে তা অবশ্যই করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [يس: ٨٢]

“আল্লাহর আদেশ তো এমনই যে, তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও। আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়।” [সূরা ইউনুছ, আয়াত: ৮২]

আর ইরাদা শারঈয়া বাস্তবায়িত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা কার্যকরী হয় আবার কখনো কার্যকরী হয় না। তা'আলা শরী'আতগতভাবে জিনিসটি বাস্তবায়িত হওয়াকে পছন্দ করেন।

যদি কোনো লোক জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ কি পাপ কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন? উত্তর হলো সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে পাপ কাজও আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়; কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেন না এবং ভালোবাসেন না, তবে আকাশ-জমিনে যা কিছু হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

প্রশ্ন: (৩৭) আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে ইলহাদ (إلحاد) কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: ইলহাদের আভিধানিক অর্থ বাঁকা হয়ে যাওয়া বা এক দিকে ঝুকে পড়া। আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّهُمۡ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُۥ بَشَرٞۗ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ ١٠٣﴾ [النحل: ١٠٣]

"যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কুরআন পরিস্কার আরবী ভাষায়।" [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৩]

লাহাদ কবর যেহেতু এক পাশ দিয়ে বাঁকা করে ভিতরের দিকে প্রবেশ করানো থাকে, তাই তাকে লাহাদ বলা হয়। সঠিক বিষয় জানা না থাকলে ইলহাদ জানা সম্ভব নয়। আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো এগুলোকে আমরা আহলে সুন্নাতদের মূলনীতি অনুযায়ী কোনো

প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিকৃতি, বাতিল এবং উপমা-দৃষ্টান্ত বর্ণনা ছাড়াই আল্লাহর শানে প্রযোজ্য অর্থে ব্যবহার করব। সুতরাং আমরা যখন সঠিক পথ জানতে পারলাম, তখন তার বিপরীত পথে যাওয়ার নামই ইলহাদ বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে বক্রপথ অবলম্বন। আলিমগণ ইলহাদকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১) আল্লাহর কোনো নাম বা কোনো গুণকে সরাসরি অস্বীকার করা: যেমন, জাহেলী যুগের লোকেরা আল্লাহর ‘রহমান’ নামটি অস্বীকার করত কিংবা নামটির প্রতি ঈমান আনয়ন করল; কিন্তু নামটি যে গুণের প্রতি প্রমাণ বহণ করে, তা অস্বীকার করল। যেমন, কোনো কোনো বিদ‘আতী বলে থাকে, আল্লাহ দয়াবিহীন দয়ালু, শ্রবণশক্তিহীন শ্রবণকারী।

২) আল্লাহ নিজেকে যে নামে নামকরণ করেন নি, সে নামে তাঁকে নামকরণ করা: এভাবে নাম রাখা ইলহাদ হওয়ার কারণ হলো আল্লাহর নামসমূহ কুরআন এবং সুন্নাহতে যেভাবে এসেছে সেভাবেই মানতে হবে। কারও পক্ষে জায়েয নেই যে, নিজ থেকে আল্লাহর নাম রাখবে। কারণ, এটি আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা বশতঃ কথা বলার শামিল। যেমন খৃষ্টানরা আল্লাহকে পিতা বলে এবং দার্শনিকরা ক্রিয়াশীল কারণ বলে থাকে।[56]

---

[56] অনেকে যেমন আল্লাহকে ‘খোদা’ বলে থাকে, এটাও মারাত্মক একটি ভুল। কেননা এটাও ইলহাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

৩) আল্লাহর নামসমূহকে সৃষ্টিকুলের গুণাবলীর প্রতি নির্দেশ দানকারী মনে করে উপমা স্বরূপ বিশ্বাস করাও ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইলহাদ হওয়ার কারণ হলো, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী মানুষের নামের মতই, সে তাকে তার আপন অর্থ হতে সরিয়ে ফেলল এবং সঠিক অর্থ বর্জন করে অন্য অর্থ গ্রহণ করল। এ রকম করা কুফুরী। বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

"তাঁর অনুরূপ আর কেউ নেই। তিনি সব কিছু জানেন এবং শুনেন।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا﴾ [مريم: ٦٥]

"তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে কি?" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬৫]

ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ নাঈম ইবন হাম্মাদ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করল, সে কুফুরী করল। যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো গুণকে অস্বীকার করল, সেও কুফুরী করল। আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাতে মাখলুকের সাথে কোনো তুলনা নেই।

৪) আল্লাহর নাম থেকে মূর্তির নাম বের করা: যেমন, ইলাহ থেকে লাত নাম বের করা, আজীজ থেকে উজ্জা এবং মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি।

এখানে ইলহাদ হওয়ার কারণ এ যে, আল্লাহর নামগুলো শুধু তার জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোনো মাখলুককে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত ইবাদাতের অংশ প্রদান করার উদ্দেশ্যে এগুলোর অর্থ স্থানান্তর করা জায়েয নেই।

আল্লাহর ‘চেহারা’, আল্লাহর ‘হাত’ ইত্যাদি সম্পর্কে

প্রশ্ন: (৩৮) আল্লাহর ‘চেহারা’, আল্লাহর ‘হাত’ এ জাতীয় যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন তা কত প্রকার?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা নিজের দিকে যেসমস্ত বিষয় সম্বন্ধ করেছেন তা তিন প্রকার। যথা:

(১) স্বয়ং সম্পূর্ণ কোনো বস্তুকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা। এটি হলো সৃষ্টিকে তার স্রষ্টার দিকে সম্পৃক্ত করার শ্রেণিভুক্ত। এটি কখনো সাধারণ ভঙ্গিতে হয়। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ أَرۡضِي وَٰسِعَةٞ فَإِيَّٰيَ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦]

“আমার জমিন অতি প্রশস্ত।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৫৬]

কখনো কোনো জিনিসের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। যেমন, বলা হয়, (بيت الله) ‘আল্লাহর ঘর’, (ناقة الله) ‘আল্লাহর উটনী’ ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন,

﴿وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]

“এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দাঁড়ায়, রুকু করে ও সাজদাহ করে।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقۡيَٰهَا﴾ [الشمس: ١٣]

“আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।” [সূরা আশ-শামস, আয়াত: ১৩]

(২) অন্যের ওপর নির্ভরশীল কোনো বস্তুকে আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা। সাধারণত সম্মানের জন্যই তাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে বলেন,

﴿وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ﴾ [النساء: ١٧١]

“তিনি আল্লাহর রূহ।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৭১]

এখানে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর রূহ-এর অর্থ হলো, আল্লাহ যে সমস্ত রূহ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর রূহও সে সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এ রূহ অন্যান্য রূহের তুলনায় অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। এই নয় যে, আল্লাহর রূহ ঈসা আলাইহিস সালাম-এর রূহের ভিতরে প্রবেশ করে আছে।

৩) আল্লাহর সিফাতকে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা: কুরআনে ব্যাপকভাবে এ ভঙ্গিতে আল্লাহর সিফাতের বিবরণ এসেছে। আল্লাহর কোনো সিফাতই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, وجه الله আল্লাহর

চেহারা, يد الله আল্লাহর হাত, قدرة الله আল্লাহর শক্তি বা ক্ষমতা, عزة الله আল্লাহর ইজ্জত বা সম্মান।

প্রশ্ন: (৩৯) আল্লাহর কোনো নাম বা গুণ অস্বীকার করার হুকুম কী?

উত্তর: আল্লাহর নাম ও গুণ অস্বীকার করা দু'ধরণের হতে পারে:

(১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে অস্বীকার করা। এটা নিঃসন্দেহে কুফুরী। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কোনো নামকে অস্বীকার করে অথবা কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত আল্লাহর কোনো গুণকে অস্বীকার করে, যেমন বলল, আল্লাহর কোনো হাত নেই, এ ধরণের কথা মুসলিমর ঐক্যমতে সম্পূর্ণ কুফুরী। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফুরী এবং তা ইসলাম থেকে মানুষকে বের করে দেয়।

(২) ব্যাখ্যার মাধ্যমে অস্বীকার করা। তা হলো সরাসরি অস্বীকার না করে ব্যাখ্যা করে অস্বীকার করা। এটি আবার দু'প্রকার।

(ক) ব্যাখ্যাটি আরবী ভাষা অনুপাতে হওয়া। এটি কুফুরী নয়।

(খ) আরবী ভাষাতে ব্যাখ্যাটির পক্ষে কোনো প্রকার যুক্তি না থাকা। এটি কুফুরীকে আবশ্যক করে। ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ না থাকলে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যেমন, কেউ বলল, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কোনো 'হাত' নেই। এমনকি 'নি'আমত' কিংবা 'শক্তি' অর্থেও নেই। এ রকম বিশ্বাস পোষণকারী কাফির। কেননা সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করল। আর যদি আল্লাহর বাণী,

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] "বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬৪]-এর ব্যাখ্যায় কেউ বলে এখানে আল্লাহর দু'হাত দ্বারা আকাশ-জমিন উদ্দেশ্য, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, আরবী ভাষাতে এধরণের ব্যাখ্যা ঠিক নয় এবং শরঈ বাস্তবতারও পরিপন্থী; কিন্তু হাতকে যদি নি'আমতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কিংবা শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে, তাহলে কাফির হবে না। কারণ, 'হাত' কখনো কখনো 'নি'আমত' অর্থে ব্যবহার হয়; কিন্তু হাতের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করলে অবশ্যই বিদ'আতীদের দলভুক্ত হবে।

প্রশ্ন: (৪০) আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতোই?

উত্তর: যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কেননা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١]

"তাঁর অনুরূপ আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১]

দু'টি জিনিসের নাম ও গুণ এক হলেই জিনিস দু'টি সকল দিক থেকে এক হওয়া জরুরি নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। মানুষের মুখমণ্ডল আছে। উটেরও মুখমণ্ডল আছে। মুখ দু'টি কি একই রকম? কখনই নয়। অনুরূপভাবে উটের হাত আছে পিপিলিকারও হাত আছে।

হাত দু'টি কি সমান? তাহলে কেন আমরা বলব না যে, আল্লাহর চেহারা আছে। তা মাখলুকাতের চেহারার অনুরূপ নয়। আল্লাহর হাত আছে। কিন্তু তা মানুষের হাতের মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦ﴾ [الزمر: ٦٧]

"তারা যথার্থভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও সম্মান বুঝতে পারে নি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ﴾ [الانبياء: ١٠٤]

"সেদিন আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪] কোনো মাখলুকের কি এ ধরণের হাত রয়েছে? কখনই নয়। সুতরাং আমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সৃষ্টিজীবের মতো নন। না সত্বায় না গুণাবলীতে। ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورا: ١١] "তাঁর মতো আর কেউ নেই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] এ জন্যই আল্লাহর কোনো সিফাতের ধরণ গঠন বা প্রকৃতি অনুসন্ধান করা ঠিক নয় কিংবা এ রকম ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহর গুণসমূহ মানুষের গুণাবলীর মতোই।

‘শেষ রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন’ এ কথার ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন: (৪১) আমরা জানি যে, রাত ভূপৃষ্ঠের উপরে ঘুর্ণায়মান। আর আল্লাহ রাতের তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। এ হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা রাতভর দুনিয়ার আকাশেই থাকেন -এর উত্তর কী?

উত্তর: আল্লাহ কুরআন মজীদে নিজেকে যেসমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং যেসমস্ত নামে নিজেকে নামকরণ করেছেন তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের ওপর ওয়াজিব। এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর যে সমস্ত নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন অস্বীকৃতি, পরিচয়ের জন্য ধরণ নির্ধারণ করা বা উপমা পেশ করা ব্যতীত তার উপর ঈমান আনা আবশ্যক। পরিবর্তন সাধারণতঃ হয়ে থাকে আয়াত ও হাদীসসমূহে। আর অস্বীকার হয়ে থাকে আকীদার ভিতরে।, পদ্ধতি ও উপমা বর্ণনা করা হয় সিফাত তথা গুণের ভিতরে। সুতরাং উপরোক্ত চারটি দোষ হতে আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিস্কার করতে হবে। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে কেন, কেমন? এ ধরণের প্রশ্ন করা যাবে না। এমনিভাবে আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে ধরণ বর্ণনার চিন্তা করা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে অনেক বিষয় সহজ হয়ে যাবে। এটাই ছিল সালাফে সালেহীনের আদর্শ। ইমাম মালেকের রহ. কাছে এক লোক এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তো ‘আরশের উপরে আছেন, তবে কীভাবে? উত্তরে ইমাম

মালেক রহ. বললেন, 'আরশের উপরে থাকার বিষয়টি জ্ঞাত আছে। কীভাবে আছেন তা আমাদের জানার বাইরে। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। '

যে ব্যক্তি বলে যেহেতু রাত সারা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে আর আল্লাহ তা'আলা রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, তাই আল্লাহ সারা রাতই এ আকাশে থাকেন। কারণ, শেষ তৃতীয়াংশ তো এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রতিনিয়ত স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

উত্তরে আমরা বলব যে, এ প্রশ্নটি কোনো সাহাবী করেন নি। যদি প্রশ্নটি কোনো মুসলিমের অন্তরে হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অবশ্যই তা বর্ণনা করতেন। আমরা বলব পৃথিবীর কোনো অংশে যতক্ষণ রাতের এক তৃতীয়াংশ থাকবে, ততক্ষণ সেখানে আল্লাহর অবতরণের বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত হবে। রাত শেষ হয়ে গেলে তা শেষ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহর অবতরণের ধরণ আমরা জানিনা। তার সঠিক জ্ঞানও আমাদের কাছে নেই। আর আমরা জানি আল্লাহর মত আর কেউ নেই। আমাদের উচিৎ হবে আল্লাহর কিতাবের সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং এ কথা বলা যে, আমরা শুনলাম এবং ঈমান আনয়ন করলাম ও অনুসরণ করলাম। এটাই আমাদের করণীয়।

আল্লাহকে দেখার মাসআলায় সালাফে সালেহীনের অভিমত কী?

প্রশ্ন: (৪২) আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে সালাফে সালেহীনের অভিমত কী? যারা বলে যে, চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণ ঈমানের নামান্তর, তাদের হুকুম কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে কিয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

﴿ وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ২২-২৩]

আয়াতে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে, কিয়ামত দিবসে জান্নাতে আল্লাহকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সমগ্র সত্ত্বাকে দর্শন করা সম্ভব হবে।

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا﴾ [طه: ١١٠]

"তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারে না।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১১০]

জ্ঞানের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে আয়ত্ব করার বিষয়টি চোখের মাধ্যমে দেখে আত্তব করার চেয়ে অধিকতর ব্যাপক। যখন জ্ঞানের মাধ্যমে

আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয় তাহলে প্রমাণিত হচ্ছে যে চর্মচক্ষু দ্বারা পরিপূর্ণভাবে দর্শন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ﴾ [الانعام: ١٠٣]

“দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০৩]

প্রকৃত পক্ষেই মানুষ আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবে; কিন্তু পরিপূর্ণভাবে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা এর অনেক উর্ধে। টাই সালাফে সালেহীনের মাযহাব। তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকা জান্নাতীদের জন্য হবে সবচেয়ে বড় নি‘আমত। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো‘আয় বলতেন,

«وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ»

উচ্চারণ: আস-আলুকা লায্যাতান নাযরি ইলা ওয়াজহিকা। অর্থ: “হে আল্লাহ আমি আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার পরিতৃপ্তি প্রার্থনা করছি।” [57]

আল্লাহর চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ খুবই বিরাট। যে ব্যক্তি আল্লাহর নি‘আমত ও অনুগ্রহ লাভ করেছে, সেই কেবল তা অনুভব করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর কাছে দো‘আ করি তিনি যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে তাঁর দিদার লাভে ধন্য করেন।

---

[57] নাসাঈ, অধ্যায়: কিতাবুস সাহু।

যারা ধারণা করে যে, আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়; বরং আল্লাহকে দেখার অর্থ পরিপূর্ণভাবে অন্তর দিয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করার নামান্তর, তাদের কথা বাতিল এবং দলীল বিরোধী। প্রকৃত অবস্থা এ ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কারণ, অন্তরের পরিপূর্ণ বিশ্বাস দুনিয়াতেই বর্তমান রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহসানের ব্যাখ্যায় বলেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

"ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে যে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।"[58] তুমি এমন ঈমান নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। এটিই পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়। যে সমস্ত আয়াত ও হাদীসে আল্লাহকে দেখার কথা আছে, সেগুলোকে অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং কুরআনের আয়াতকে তার আসল অর্থ হতে পরিবর্তন করার শামিল। করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: (৪৩) জিন্নের আক্রমণ থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর: সন্দেহ নেই যে, জিন্নেরা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কষ্ট দিতে পারে। কখনো জিন্নেরা মানুষকে মেরে ফেলে। কখনো বা পাথর নিক্ষেপ করে এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখায়। জিন্নদের এ সকল

[58] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

কর্ম হাদীস এবং বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের দিন জনৈক সাহাবীকে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। কারণ, তিনি নতুন বিবাহিত যুবক ছিলেন। ঘরে ফিরে যুবক দেখলেন, স্ত্রী ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ দেখে তিনি তার প্রতি মনক্ষুন্ন হলেন। স্ত্রী বললেন, ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন বিছানার উপরে একটি সাপ ব্যাড় দিয়ে বসে রয়েছে। হাতেই ছিল বর্শা। বর্শা দিয়ে সাপকে আঘাত করার সাথে সাথে সাপটি মারা গেল এবং উক্ত সাহাবীও মারা গেলেন। সাপ এবং সাহাবীর মধ্যে কে আগে মারা গেল, তা জানা যায় নি। এ সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছার পর তিনি ঘরের মধ্যে বসবাসকারী সাপগুলো মারতে নিষেধ করলেন। তবে পিঠের উপরে রেখা বিশিষ্ট এবং লেজহীন ছোট ছোট সাপগুলো ব্যতীত।[59] এ ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, জিন্নেরা মানুষের উপরে আক্রমণ করে এবং কষ্ট দেয়। মুতাওয়াতের এবং মাশহুর সনদে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মানুষ কখনো কখনো পুরাতন এবং ধ্বংস প্রাপ্ত বাড়ী-ঘরে প্রবেশ করলে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ সেখানে কোনো মানুষ দেখতে পায় না। কখনো কখনো আওয়াজ এবং গাছের পাতার নাড়াচাড়া শুনতে পায়। এতে মানুষ ভয় পায়। এমনিভাবে আসক্ত হয়ে কিংবা কষ্ট দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো

[59] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: বাদউল খাল্ক

কারণে জিন্ন মানুষের শরীরেও প্রবেশ করে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান (জিন্ন) আছর করে ভারসাম্যহীন পাগলের মতো করে দেয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫] কখনো জিন্নেরা মানুষের শরীরে মিশে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বলে। জিন্নে ধরা রোগীর কাছে কবিরাজ যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করে, তখন জিন্ন তার সাথে কথা বলে। কবিরাজ জিন্নের কাছ থেকে পুনরায় না আসার অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এ ধরণের আরো কথা হাদীসে বর্ণিত আছে এবং জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, জিন্নের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সুন্নাহতে বর্ণিত দো‘আগুলো পাঠ করতে হবে। তার মধ্যে আয়াতুল কুরসী অন্যতম। কোনো লোক রাত্রিতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে একজন হিফাযতকারী থাকে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটেও আসতে পারে না।

প্রশ্ন: (৪৪) জিন্নেরা কি গায়েব জানে?

উত্তর: জিন্নেরা গায়েব জানে না। আল্লাহ ব্যতীত আকাশ-জমিনের কোনো মাখলুকই গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَمَّا قَضَيۡنَا عَلَيۡهِ ٱلۡمَوۡتَ مَا دَلَّهُمۡ عَلَىٰ مَوۡتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلۡأَرۡضِ تَأۡكُلُ مِنسَأَتَهُۥۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلۡجِنُّ أَن لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٱلۡغَيۡبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلۡعَذَابِ ٱلۡمُهِينِ ١٤﴾ [سبا: ١٤]

"যখন আমি তাঁর (সুলাইমানের) মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিন্নদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিন্নেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এ লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।" [সূরা সাবা, আয়াত: ১৪]

সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে গায়েবের দাবী করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কাউকে ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করবে, সেও কাফির। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: ٦٥]

"বলুন আসমান-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।" [সূরা আন-নামল. আয়াত: ৬৫]

যারা ভবিষ্যতের সংবাদ জানে বলে দাবী করে, তাদেরকে গণক বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবূল হবে না।[60] গণকের কথা বিশ্বাস করলে কাফিরে পরিণত হবে। কারণ, গণকের কথা বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: ٦٥]

“আসমান-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

প্রশ্ন: (৪৫) যারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর হাবীব) বলে তাদের হুকুম কী?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্ধু। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহকে তিনি খুব ভালোবাসতেন আল্লাহও তাকে খুব ভালোবাসেন; কিন্তু এর চেয়ে উত্তম শব্দ দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা যায়। তাহলো খালীলুল্লাহ বা আল্লাহর নিকটতম বন্ধু। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্ধু। তিনি বলেন,

«إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»

---

[60] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস সালাম।

“আল্লাহ তা‘আলা আমাকে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমনভাবে আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নিকটতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।”[61]

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাবীবুল্লাহ গুণে গুণান্বিত করল, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা কমিয়ে দিল। হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর মর্যাদা বেশি। প্রতিটি মুমিনই আল্লাহর হাবীব; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এর চেয়ে বেশি। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খলীল বা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই আমরা বলি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খলীলুল্লাহ। কারণ, হাবীবুল্লাহর চেয়ে খলীলুল্লাহর ভিতরে বন্ধুত্বের অর্থ বেশি পরিমাণে বর্তমান রয়েছে।

প্রশ্ন: (৪৬) দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করার হুকুম কী?

উত্তর: দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা হারাম। এখানে জানা দরকার যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাকারীগণ দু’ভাগে বিভক্ত।

[61] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: মুকাদ্দামাহ।

১) বাড়াবাড়ি ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করাতে অসুবিধা নেই। অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে যে সমস্ত সৎ গুণাবলী রয়েছে, তা বর্ণনা করাতে কোনো দোষ নেই।

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা। তিনি এটা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

"নাসারা সম্প্রদায় যেমনভাবে ঈসা ইবন মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা সেভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল"।[62]

অতএব, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা এভাবে করবে যে, তিনি আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দাতা, বিপদ গ্রস্থের আহ্বানে সাড়া দানকারী, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক, তিনি গায়েবের খবর জানেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রশংসা করা হারাম; বরং কখনো ইসলাম থেকে বহিস্কারকারী শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সুতরাং বেশি বাড়াবাড়ি করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করা ঠিক নয়।

[62] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবু আহাদীসুল আম্বিয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে দুনিয়ার স্বার্থ অর্জন করা হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তা বর্ণনা করা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে জিনিস ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত তাকে দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নয়।

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦﴾ [هود: ١٥، ١٦]

“যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবেনা। এরাই হলো সেসব লোক, আখেরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হয়েছে।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬] আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধান দাতা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরি?

প্রশ্ন: (৪৭) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ নন; বরং তিনি আল্লাহর নূর। অতঃপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, তিনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক, তার হুকুম কী? এ ধরণের লোকের পিছনে সালাত আদায় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর: যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূর (বা আল্লাহর যাতী নূর) মানুষ নন, তিনি গায়েবের খবর জানেন, সে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে কুফুরী করল। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু, বন্ধু নয়। কেননা তার কথা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, সে কাফির। বলেন,

﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ﴾ [الكهف: ١١٠]

“আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: ٦٥]

“আসমান-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না”।

[সূরা আন-নামল. আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ﴾ [الانعام: ٥٠]

"আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে আমি ফিরিশতা। আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ ١٨٨﴾ [الاعراف: ١٨٨]

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু কল্যাণ অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনো হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদদাতা।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي»

"আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনি ভুলে যাই। আমি ভুল করলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও।"[63]

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এ বিশ্বাসে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো-মন্দের মালিক, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে অপমানিত অবস্থায়।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢﴾ [الجن: ٢١، ٢٢]

"বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে

[63] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুস্ সালাহ।

পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাবনা।” [সূরা জিন্ন, আয়াত: ২১-২২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে বলেছেন,

«لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারব না।”[64]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর বংশধর) তাঁর কন্যা ফাতেমা ও ফুফু সাফিয়াকে একই কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি তাকে নূরের তৈরি বলে বিশ্বাস করে, তাকে ইমাম নিয়োগ করা এবং তার পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ নয়।

প্রশ্ন: (৪৮) ইমাম মাহদীর আগমণ সংক্রান্ত হাদীসগুলো কি সহীহ?

উত্তর: মাহদী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো চারভাগে বিভক্ত।

১) মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস

২) দঈফ হাদীস

৩) হাসান হাদীস,

৪) সহীহ হাদীসেও ইমাম মাহদীর আগমণের কথা বর্ণিত হয়েছে, তবে ইরাকের সিরদাব নামক স্থানে লুকায়িত রাফেজীদের কল্পিত মাহদীর

---

[64] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ওসায়া।

সাথে হাদীসে বর্ণিত মাহদীর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি রাফেজীদের পক্ষ থেকে একটি বানোয়াট কাহিনী। সহীহ হাদীসে যে মাহদীর কথা বলা হয়েছে, তিনি অন্যান্য বনী আদমের মতই একজন লোক হবেন। তিনি যথা সময়ে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং মানব সমাজে আত্মপ্রকাশ করবেন। এটিই ইমাম মাহদীর প্রকৃত ঘটনা। সুতরাং ইরাকের সিরদাব অঞ্চলে লুকায়িত মাহদীর আগমণে বিশ্বাস করা মারাত্মক ভুল এবং বিবেক বহির্ভূত ও ভিত্তিহীন ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত ইমাম মাহদীর আগমণ সত্য।

প্রশ্ন: (৪৯) ইয়াজুজ-মাজুজ কারা?

উত্তর: ইয়াজুজ মাজুজ বনী আদমের অন্তর্ভুক্ত দু'টি জাতি। তারা বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যুল-কারনাইনের ঘটনায় বলেন,

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝٩٣ قَالُواْ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝٩٤ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝٩٥ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝٩٦ فَمَا ٱسْطَٰعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَٰعُواْ لَهُۥ نَقْبًا ۝٩٧ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّيۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءَۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝٩٨﴾ [الكهف: ٩٣، ٩٨]

“অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে যুল-কারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এ শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রচীর নির্মাণ করে দিবেন। তিনি বললেন, আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা হাঁপরে ফুঁক দিতে থাক। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস। আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজের দল তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না। - কারনাইন বললেন, এটা আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবর প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৯৩-৯৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ (وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا»

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আদম আলাইহিস সালামকে ডাক দিবেন। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাযির আছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার বংশধর থেকে জাহান্নামী দলকে পৃথক কর। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, জাহান্নামের দল কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেক এক হাজারের মধ্যে থেকে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন কোলের শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। গর্ভবতী মহিলারা সন্তান প্রসব করে দেবে। মানুষদেরকে আপনি মাতাল অবস্থায় দেখবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন। সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে থেকে কে হবে সেই এক ব্যক্তি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের মধ্যে থেকে হবে সেই এক ব্যক্তি। আর বাকীরা হবে ইয়াজুজ-মাজুজের দল।"[65]

ইয়াজুজ-মাজুজের দল বের হয়ে আসা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা পেরেশান ও রক্তিম চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বলছিলেন,

---

[65] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: আহাদীসুল আম্বিয়া।

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا»

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আরবদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। অকল্যাণ নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এ পরিমাণ খুলে দেওয়া হয়েছে। এ বলে তিনি হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি আঙ্গুলি দিয়ে গোলাকৃতি করে দেখালেন।”[66]

প্রশ্ন: (৫০) নবীগণ কেন তাদের উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সাবধান করেছেন? অথচ দাজ্জাল তো শেষ যামানাতেই বের হবে।

উত্তর: আদম সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে দাজ্জালের ফিতনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন। এজন্য নূহ আলাইহিস সালাম থেকে আরম্ভ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবীই তাদের সম্প্রদায়কে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। যাতে তারা সাবধান থাকতে পারে এবং দাজ্জালের বিষয়টি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। রাসূলদের দায়িত্ব ছিল উম্মতকে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সাবধান করা। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

[66] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

“আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকাবস্থায় যদি দাজ্জাল বের হয়, তাহলে আমি একাই তার সাথে যুদ্ধ করব এবং তাকে প্রতিহত করব। আমি চলে গেলে যদি তার আগমণ ঘটে, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজেকে তার ফিতনা থেকে রক্ষা করবে। আমার পরে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হিফাযত করবেন।”[67]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনা পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় ফিতনা, তাই বিশেষভাবে সালাতের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি শেষ বৈঠকে এ দো‘আটিও পাঠ করতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নাম এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি দাজ্জালের ফিতনা হতে।”

দাজ্জাল শব্দটি (دجل) থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা ইত্যাদি। দাজ্জাল যেহেতু সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এবং সবচেয়ে বড় প্রতারক। তাই তাকে দাজ্জাল বলে নাম রাখা হয়েছে।

---

[67] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

প্রশ্ন: (৫১) যারা পরকালের জীবনকে অবিশ্বাস করে এবং বলে এ বিশ্বাস মধ্যযুগের একটি কল্পকাহিনী ও কুসংস্কার মাত্র- এ ধরণের মানুষকে কীভাবে বুঝানো সম্ভব?

উত্তর: যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করবে এবং বলবে এটি মধ্যযুগের কল্পিত কাহিনী মাত্র, সে কাফির। আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوٓاْ إِنۡ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا وَمَا نَحۡنُ بِمَبۡعُوثِينَ ٢٩ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ قَالَ أَلَيۡسَ هَٰذَا بِٱلۡحَقِّۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٣٠﴾ [الانعام: ٢٩، ٣٠]

“তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। আর যদি আপনি তাদেরকে দেখেন, যখন তাদেরকে রবের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম। তিনি বলবেন, অতএব, স্বীয় কুফুরীর কারণে শাস্তি আস্বাদন কর।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ২৯-৩০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ إِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٣ كَلَّاۖ بَلۡۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم

مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۝١٤ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٖ لَّمَحْجُوبُونَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۝١٦ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۝١٧﴾ [المطففين: ١٠، ١٧]

"সে দিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের। যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপীই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, ইহা পুরাতনকালের রূপকথা। কখনো না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। কখনো না তারা সেদিন তাদের রব থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ১০-১৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١﴾ [الفرقان: ١١]

"বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আমরা তার জন্য অগ্নি প্রস্তুত করেছি।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ১১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٣﴾ [العنكبوت: ٢٣]

“যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। তাদের জন্যই যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” [সূরা আল-‘আনকাবুত, আয়াত: ২৩]

যারা পরকালকে অবিশ্বাস করে তাদের কাছে নিম্নবর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করা হবে:

প্রথমত: কিয়ামত এবং পরকালের বিষয়টি যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে আসমানী কিতাবসমূহে মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহ তা কবূল করে নিয়েছে। অতএব, তোমরা কীভাবে নবী-রাসূলদের কথা অমান্য করে পরকালকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা দার্শনিক কিংবা কোনো বাতিল ফিরকার প্রবর্তকের কথা বিশ্বাস করে থাক।

দ্বিতীয়ত: কিয়ামত হওয়ার বিষয়টি বিবেক দ্বারাও স্বীকৃত এবং সমর্থিত। তা কয়েকভাবে হতে পারে:

১) প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, সে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এসেছে। যিনি প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِۚ﴾ [الروم: ٢٧]

“তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য তুলনামূলক বেশি সহজ।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلۡكُتُبِۚ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤﴾ [الانبياء: ١٠٤]

“যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৪]

২) আকাশ-জমিনের সৃষ্টির বড়ত্ব ও অভিনবত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। যিনি এ দু’টিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করতে এবং পুনরায় তাদের প্রথমবারের মতো সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন,

﴿لَخَلۡقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَكۡبَرُ مِنۡ خَلۡقِ ٱلنَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]

“নিশ্চয় আকাশ-জমিনের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির চেয়ে অনেক বড়।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৫৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَلَمۡ يَعۡيَ بِخَلۡقِهِنَّ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحۡـِۧيَ ٱلۡمَوۡتَىٰۚ بَلَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٣٣﴾ [الاحقاف: ٣٣]

“তারা কি জানে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তিনি এবং এ গুলোর সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেন নি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَوَ لَيۡسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخۡلُقَ مِثۡلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلۡخَلَّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ ٨١ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [يس: ٨١، ٨٢]

“যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলে দেন, হও তখনই তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮১-৮২]

৩) প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি জমিনকে মৃত অবস্থায় দেখে। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার সাথে সাথে তা উর্বর হয়ে উঠে এবং সেখানে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যিনি মৃত জমিনকে জীবিত করতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلۡأَرۡضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰٓۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩﴾ [فصلت: ٣٩]

“তাঁর এক নিদর্শন এ যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর অবস্থায় পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন শস্যশ্যামল ও স্ফীত হয়ে উঠে। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৯]

৪) বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, তা পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার সত্যতা প্রমাণ বহন করে। সূরা

আল-বাকারাতে এ ধরণের পাঁচটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿أَوۡ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرۡيَةٖ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحۡيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٖ ثُمَّ بَعَثَهُۥۖ قَالَ كَمۡ لَبِثۡتَۖ قَالَ لَبِثۡتُ يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖۖ قَالَ بَل لَّبِثۡتَ مِاْئَةَ عَامٖ فَٱنظُرۡ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمۡ يَتَسَنَّهۡۖ وَٱنظُرۡ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَةٗ لِّلنَّاسِۖ وَٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡعِظَامِ كَيۡفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكۡسُوهَا لَحۡمٗاۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٥٩﴾ [البقرة: ٢٥٩]

"তুমি কি সে লোককে দেখ নি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যা ছিল জনমানব শুণ্য, দেওয়ালগুলো বিধ্বস্ত ছাদে পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর এ জনপদকে পুনরায় জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে। সেগুলো পচে যায় নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হলো, তখন বলে উঠল আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৯]

৫) প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় কর্মের যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার জন্য পুনরুত্থান আবশ্যক। তা না হলে মানুষ সৃষ্টির কোনো মূল্য থাকে না এবং পার্থিব জীবনে মানুষ ও পশুর মাঝেও কোনো পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ ١١٥ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ ١١٦﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦]

“তোমরা কি ধারণা কর যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। অতএব, মহিমান্বিত আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বূদ নেই। তিনি সম্মানিত ‘আরশের মালিক।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৫-১১৬]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخۡفِيهَا لِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا تَسۡعَىٰ ١٥﴾ [طه: ١٥]

“কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡ لَا يَبۡعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُۚ بَلَىٰ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٨ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَٰذِبِينَ ٣٩ إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٤٠﴾

[النحل: ٣٨، ٤٠]

“তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং কাফিররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। আমি যখন কোনো কিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৮-৪০]

আল্লাহ বলেন,

﴿زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ۝٧﴾ [التغابن: ٧]

“কাফিররা দাবী করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার রবের কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।” [সূরা আত-তাগাবূন, আয়াত: ৭]

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য উপরোক্ত প্রমাণগুলো পেশ করার পরও যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তারা অতিসত্বরই তাদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হবে।

প্রশ্ন: (৫২) কবরের আযাব কি সত্য?

উত্তর: কুরআনের প্রকাশ্য আয়াত, সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং মুসলিমদের ঐকমত্যে কবরের আযাব সত্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কবর আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন।"[68]

সকল মুসলিমই সালাতে বলে,

«أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" সাধারণ মানুষ এবং আলিম-উলামা সবাই এ দো'আটি পাঠ করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾ [غافر: ٤٦]

[68] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল জান্নাত।

“সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪৬]

কোনো সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে আনন্দ-ফুর্তি করার জন্য জাহান্নামের আগুনের উপরে পেশ করা হবে না; বরং তার আযাব ভোগ করার জন্য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ﴾ [الانعام: ٩٣]

“আপনি যদি যালিমদেরকে ঐ সময়ে দেখতে পেতেন, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফিরিশতাগণ তাদের হাত বাড়িয়ে বলবেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আন। তোমাদের আমলের কারণে আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেওয়া হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তাঁর আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে।” [সুরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯৩] আর এ আয়াতের মধ্যে ‘আজ’ বলতে মৃত্যুর দিনকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কুরআন, সুন্নাহ এবং মুসলিমদের ঐক্যমতে কবরের আযাব সত্য।

স্বাভাবিক দাফন না হলেও কবরে আযাব হবে।

প্রশ্ন: (৫৩) মৃত লাশকে যদি হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হয় তবেও কি কবরের আযাব হবে?

উত্তর: অবশ্যই হবে। কারণ, আযাব হবে রূহের। , তাই এ কথা বলা যাবে না যে, দেহের কোনো আযাবই হবে না। যদিও তা নষ্ট হয়ে গেছে বা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বিষয়টি পরকালের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়াতে দৃশ্যমান কোনো বস্তুর সাথে পরকালের গায়েবী বিষয়ের তুলনা চলে না।

কবরের আযাব অস্বীকার করার বিধান।

প্রশ্ন: (৫৪) এক শ্রেণির লোক কবরের আযাব অস্বীকার করার পক্ষে দলীল পেশ করে যে, কবর খনন করলে দেখা যায় লাশ রয়ে গেছে, কোনো পরিবর্তন হয় নি এবং কবর সংকীর্ণ অথবা প্রশস্তও হয় নি। কীভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তর: আমরা বলব কবরের আযাব কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য বলে প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ۝٤٦﴾ [غافر: ٤٦]

“সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফির‘আউন গোত্রকে কঠিনতম আযাবে প্রবেশ করাও।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৪৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَلَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

“তোমরা যদি দাফন না করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করতাম, যা আমি নিজে

শ্রবণ করে থাকি। অর্থাৎ তোমরা যেহেতু একে অপরকে দাফন করে থাক, তাই আমি তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানোর জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করা বাদ দিলাম। কারণ, তোমরা কবরের আযাব শুনতে পেলে দাফন করা বাদ দিবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন, نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ‘আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন, نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ‘আমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[69]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন,

«يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ»

“তার কবরকে চোখের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।”[70]

এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যা শুধুমাত্র ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করা মোটেই জায়েয নয়; বরং তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে নেওয়া আবশ্যক। তাছাড়া কবরের আযাব হবে রূহের উপরে। শরীরের উপরে

---

[69] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল জান্নাহ।

[70] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: জানাযা।

নয়। শরীরের উপরে হলে তা দেখা যেত, তখন বিষয়টি গায়েবের ওপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হতো না; কিন্তু কবরের আযাবের বিষয়টি আলমে বরযখের তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয়াদি দ্বারা এটাকে উপলব্ধি করা যাবে না।

কবরের আযাব, শান্তি, কবরের প্রশস্ততা এবং সংকীর্ণতা এসব বিষয় কেবল মৃত ব্যক্তিই অনুভব করতে পারে, অন্য কেউ নয়। কখনো কখনো মানুষ স্বপ্নে দেখে যে, সে কোথাও যাচ্ছে, আকাশে উড়ছে, কাউকে প্রহার করছে কিংবা তাকে কেউ প্রহার করছে। আরো দেখে যে, সে এক সংকীর্ণময় স্থানে আছে অথবা প্রশস্ত কোনো স্থানে আনন্দময় জীবন যাপন করছে। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশের লোকেরা কিছুই অনুভব করতে পারে না। সুতরাং আমাদের উচিৎ এ সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করা, বিশ্বাস করা এবং সেগুলোর আনুগত্য করা।

প্রশ্ন: (৫৫) পাপী মুমিনের কবরের আযাব কি হালকা করা হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, কখনো কখনো কবরের আযাব হালকা করা হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, এ দু'জনকে কবরের মধ্যে আযাব দেওয়া হচ্ছে, তবে বড় কোনো অপরাধের কারণে আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না, আর দ্বিতীয়জন চুগলখোরী করত অর্থাৎ একজনের কথা অন্য জনের কাছে লাগাতো। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তাজা খেজুরের শাখা নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরের উপরে

একটি করে পুঁতে দিয়ে বললেন, সম্ভবত খেজুরের শাখা দু'টি শুকানোর পূর্ব পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে। এ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, আযাব কখনো হালকা করা হয়। তবে প্রশ্ন রয়ে যায় যে, আযাব হালকা হওয়ার সাথে খেজুরের শাখার সম্পর্ক কী?

উত্তরে বলা যায় যে, খেজুরের শাখা তাজা থাকাকালে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করবে। তাসবীহ মৃতের কবরের আযাব হালকা করে থাকে। এর ওপর ভিত্তি করে আযাব হালকা হওয়ার আশায় কেউ যদি কবরের পাশে তাসবীহ পাঠ করে, তাহলে জায়েয হবে না। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, তাজা খেজুরের শাখা তাসবীহ পাঠ করে বলে আযাব হালকা করা হয়, এ কারণটি দুর্বল। তাজা বা শুকনো সকল বস্তুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে। আল্লাহ বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾ [الاسراء: ٤٤]

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে অর্থাৎ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের তাসবীহ শুনতে পেতেন। অথচ পাথর জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আযাব হালকা করার মূল কারণ কী?

উত্তরে বলা যায় যে, তিনি খেজুরের শাখা দু'টি সজিব থাকা পর্যন্ত কবরের আযাব হালকা করার জন্য দো'আ করেছিলেন। বুঝা গেল শাস্তি মুলতবী থাকার সময়সীমা বেশি দিন দীর্ঘ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ দু'টি কর্ম মানুষকে সাবধান করার জন্যই এরকম করেছিলেন। কারণ, তাদের কাজ দু'টি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের একজন পেশাব থেকে ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করতনা। অন্যজন মানুষের মাঝে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাতো। এটা করা কবীরা গুনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সতর্ক করার জন্য সাময়িক সুপারিশ করেছেন।

কতক আলিম বলেছেন, কবরের আযাব হালকা করার জন্য কবরের উপরে খেজুরের শাখা অথবা গাছ পুঁতে রাখা সুন্নাত; কিন্তু এ ধরণের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। কারণ,

১) এ কবরবাসীকে আযাব দেওয়া হচ্ছে কি না তা আমরা জানি না, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানতে পেরেছন।

২) আমরা যদি কবরের উপরে তা রাখি, তাহলে আমরা মৃতের ওপরে খারাপ আচরণ ও মন্দ ধারণা পোষণ করলাম। আমরা জানি না হতে পারে সে শান্তিতে আছে। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে মৃত্যুর পূর্বে তাকে তাওবা করার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই সে আযাব থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

৩) সালাফে ছালেহীনের কেউ কোনো কবরের উপরে খেজুরের শাখা রাখতেন না। অথচ তারা আল্লাহর শরী‘আত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খেজুরের শাখা পুঁতে রাখার চেয়ে ভালো জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির দাফন সমাধা করার পর তিনি বলতেন,

«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

“তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য ঈমানের ওপর অটল থাকার তাওফীক কামনা কর। কেননা তাকে এখনই জিজ্ঞাসা করা হবে”।[71]

প্রশ্ন: (৫৬) শাফা‘আত কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: শাফা‘আত শব্দটির আভিধানিক অর্থ মিলিয়ে নেওয়া, নিজের সাথে একত্রিত করে নেওয়া। শরী‘আতের পরিভাষায় কল্যাণ লাভ অথবা অকল্যাণ প্রতিহত করার আশায় অপরের জন্য মধ্যস্থতা করাকে শাফা‘আত বলে। শাফা‘আত দু’প্রকার। যথা:

প্রথমত: শরী‘আত সম্মত শাফা‘আত। কুরআন ও সুন্নাহয় এ প্রকার শাফা‘আতের বর্ণনা এসেছে। তাওহীদপন্থীগণ এ ধরণের শাফা‘আতের

[71] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুল জানায়েয।

হকদার হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন,

«مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ»

“কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি আপনার শাফা‘আতের বেশি হকদার হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার হাদীস শেখার আগ্রহ দেখে আমার ধারণা ছিল যে, তোমার পূর্বে এ বিষয় সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফা‘আতের সবচেয়ে বেশি হকদার হবে।[72] এ প্রকার শাফা‘আতের জন্য ৩টি শর্ত রয়েছে।

১- শাফা‘আতকারীর ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

২- যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার উপরও আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা।

৩- শাফা‘আতকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফা‘আত করার অনুমতি থাকা।

[72] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ইলম।

আল্লাহ তা‘আলা এ শর্তগুলো কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ ٢٦﴾ [النجم: ٢٦]

“আকাশে অনেক ফিরিশতা রয়েছেন, যাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসু হয় না। কিন্তু আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন এবং যাকে শাফা‘আত করার অনুমতি দেন তার কথা ভিন্ন।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ বলেন,

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

“কে এমন আছে যে, সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া?” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]

আল্লাহ বলেন,

﴿يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا ١٠٩﴾ [طه: ١٠٩]

“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোনো উপকারে আসবে না।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১০৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾ [الانبياء: ٢٨]

“তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৮]

সুতরাং শাফা‘আত পাওয়ার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত থাকা আবশ্যক। এ শাফা‘আত আবার দু’প্রকার

১) সাধারণ শাফা‘আত: সাধারণ শাফা‘আতের অর্থ হলো, সৎ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এবং যার জন্য ইচ্ছা আল্লাহ শাফা‘আত করার অনুমতি দিবেন। এ ধরণের শাফা‘আত আল্লাহর অনুমতি পেয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নবী-রাসূল, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং নেককারগণ করবেন। তাঁরা পাপী মুমিনদেরেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন।

২) বিশেষ ও নির্দিষ্ট সুপারিশ: এ ধরণের শাফা‘আত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট। এ শাফা‘আতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো হাশরের মাঠের শাফা‘আত। হাশরের মাঠে মানুষ যখন বিপদে পড়ে যাবে এবং অসহনীয় আযাবে গ্রেপ্তার হবে, তখন তারা একজন সুপারিশকারী খুঁজে ফিরবে। যাতে করে তারা এ ভীষণ সংকট থেকে রেহাই পেতে পারে। প্রথমে তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে গমণ করবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালামের কাছে যাবে। তারা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। অবশেষে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তিনি মানুষকে এ বিপদজনক অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তাঁর দো‘আ এবং

শাফা‘আত কবূল করবেন। এটিই হলো সুমহান মর্যাদা, যা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَتَهَجَّدۡ بِهِۦ نَافِلَةٗ لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا ٧٩﴾ [الاسراء: ٧٩]

“আপনি রাত্রির কিছু অংশ জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত (নফল ইবাদাত)। আপনার রব অচিরেই আপনাকে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৭৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত সুপারিশ করবেন, তার মধ্যে জান্নাতবাসীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করানোর সুপারিশ অন্যতম। জান্নাতবাসীগণ যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপরে আটকানো হবে। সেখানে তাদের পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। -নির্যাতন থেকে পবিত্র করার পর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশক্রমে জান্নাতের দরজা খোলা হবে।

দ্বিতীয়ত: শরী‘আত বিরোধী শাফা‘আত: এধরণের শাফা‘আত কোনো কাজে আসবে না। মুশরিকরা আল্লাহর নিকটে তাদের বাতিল মা‘বূদদের কাছ থেকে এধরণের শাফা‘আতের আশা করে থাকে। অথচ এ শাফা‘আত তাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ٤٨﴾ [المدثر: ٤٨]

"কোনো সুপারিশকারীর সুপারিশ তাদের উপকারে আসবে না।" [সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪৮] কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শির্কের ওপর সন্তুষ্ট নন। তাদের জন্য শাফা'আতের অনুমতি দেওয়াও সম্ভব নয়। আল্লাহ যার উপর সন্তুষ্ট হবেন, কেবল তার জন্যই সুপারিশ বৈধ। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য ফাসাদ ও কুফুরী পছন্দ করেন না। মুশরিকরা কী যুক্তিতে মূর্তি পূজা করত তা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

﴿هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]

"এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

সুতরাং মুশরিকরা তাদের বানোয়াট মূর্তিদের উপাসনা করার পিছনে যুক্তি ছিল যে, মূর্তিরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এটা তাদের মূর্খতার পরিচয়। কারণ, তারা এমন জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করে, যা তাদেরকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রশ্ন: (৫৭) মুমিনদের শিশু বাচ্চাদের পরিণাম কী? মুশরিকদের যে সমস্ত শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের অবস্থা কী হবে?

উত্তর: মুমিনদের শিশু সন্তানগণ তাদের পিতাদের অনুসরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١﴾ [الطور: ٢١]

“যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্মের জন্য দায়ী হবে।” [সূরা আত-তূর, আয়াত: ২১]

অমুসলিমদের নাবালক শিশুদের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হলো, আমরা বলব আল্লাহই ভালো জানেন বড় হলে তারা কী আমল করত? দুনিয়ার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তারা তাদের পিতা-মাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আখেরাতে তাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে।[73] পরকালে তাদের কী হবে সেটা জানার ভিতরে আমাদের কোনো লাভ নেই। দুনিয়াতে তাদের বিধান হলো, তারা প্রাপ্ত বয়স্ক মুশরিকদের মতই হবে। মারা গেলে তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে না, কাফন পরানো হবে না, তাদের উপর জানাযার সালাত পড়া হবে না এবং মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা হবে না।

প্রশ্ন: (৫৮) জান্নাতে পুরুষদের জন্য হুর থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো মহিলাদের জন্য কী আছে?

[73] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল জানায়েয।

উত্তর: জান্নাতীদের নি‘আমত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ [فصلت: ٣١]

“সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবী কর।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١]

“এবং তথায় রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭১]

ইহা জানা কথা যে, মন যা চায়, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো বিবাহ করার মনোবাসনা। তা জান্নাতীদের জন্য অর্জিত হবে। চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক। মহিলাকে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে তাঁকে তাঁর দুনিয়ার স্বামীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিবেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٨﴾ [غافر: ٨]

“হে আমাদের রব! আর তাদেরকে প্রবেশ করাও চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৮] আর

দুনিয়াতে যদি অবিবাহিত থাকে তাহলে জান্নাতে তার নয় জুড়ানো কোনো পুরুষের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করবেন

প্রশ্ন: (৫৯) জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা -কথাটি কি ঠিক? ঠিক হয়ে থাকলে কারণ কী?

উত্তর: জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে মহিলা -কথাটি ঠিক। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা খুৎবা প্রদানের সময় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»

“হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি করে সাদকা কর। কারণ, আমি জাহান্নামের অধিকাংশকেই দেখেছি তোমাদের মধ্যে থেকে। জাহান্নামের অধিকংশ অধিবাসী কেন মহিলাদের মধ্যে থেকে হবে -এ প্রশ্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, তোমরা বেশি পরিমাণে মানুষের ওপর অভিশাপ করে থাক এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার কর।”[74]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে নারীদের বেশি হারে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। তারা বেশি পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

---

[74] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল হায়য।

তাকদীরের মাসআলা এড়িয়ে চলার বিধান।

প্রশ্ন: (৬০) পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় যারা তাকদীরের মাসআলাসহ আকীদার বিভিন্ন বিষয় পাঠ করা পছন্দ করেন না, তাদের জন্য আপনার উপদেশ কী?

উত্তর: তাকদীরের বিষয়টি আকীদার অন্যান্য মাসআলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের উচিৎ এ মাসআলাটি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা অর্জন করা। কেননা এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সন্দেহের ওপর থাকা ঠিক নয়; কিন্তু যে সমস্ত বিষয় না শিখলে অথবা বিলম্বে শিখলে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে, তা অবশ্যই শিখতে হবে। তাকদীরের মাসআলাটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা ভালোভাবে শিক্ষা করা প্রতিটি বান্দার ওপর আবশ্যক। মূলতঃ তাকদীরের মাসআলায় কোনো সমস্যা নেই। মানুষের কাছে আকীদার আলোচনা কঠিন হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, তারা আকীদা শিখতে গিয়ে ‘কীভাবে’ কথাটিকে ‘কেন’ কথার ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ মানুষকে তার আমলের ব্যাপারে দু’টি প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। কেন করলে এবং কীভাবে করলে। আমলটি কেন করেছো এটি হলো ইখলাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। আর কীভাবে করেছো এটি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ কীভাবে করেছো এটির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেন করতে হবে এ বিষয়টির প্রতি তেমন কোনো গুরুত্বই দেয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চায়; কিন্তু আকীদার বিষয়টির উপরে কোনো গুরুত্ব দেয় না। দুনিয়াবী বিষয়ে মানুষ খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অথচ তার অন্তর আল্লাহ (আকীদা, ইখলাছ ও তাওহীদের বিষয়) সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। মূলতঃ দেখা যায় কতিপয় মানুষ বর্তমানে দুনিয়া পূজারী হয়ে গেছে। অথচ সে টেরও পাচ্ছে না। অনেক মানুষ আল্লাহর সাথে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। অথচ সে অনুভবও করতে পারে না। আকীদার বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলিম সমাজ পর্যন্ত অনেকেই গুরুত্ব প্রদান করে না। এ বিষয়টি খুবই ভয়াবহ। অবশ্য বিনা আমলে শুধু মাত্র আকীদার উপরে গুরুত্ব দেওয়াও ভুল। কারণ, আমল হলো আকীদা সংরক্ষণের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। আমরা রেডিও-টিভি এবং পত্র-পত্রিকায় শুনতে পাই যে, পরিচ্ছন্ন আকীদাই হলো দীন। আকীদার ওপর গুরুত্ব দেওয়াতে দীনের কিছু কিছু হারাম বিষয়কে হালাল করে নেওয়ার আশংকা রয়েছে। এই যুক্তিতে যে, আকীদা ঠিক আছে।

মোটকথা এ যে, মানুষের উপর আকীদার বিষয়গুলো শিক্ষা করা আবশ্যক। যাতে করে তারা আল্লাহর নাম, গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতা ও তাঁর বিধানাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে পারে। নিজে বিভ্রান্ত না হয় এবং অপরকে বিভ্রান্ত না করে। তাওহীদের জ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এ

জন্য বিদ্বানগণ ইলমে তাওহীদকে 'ফিকহে আকবার' বা সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহ বলে নাম রেখেছেন।[75] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।"[76]

দীনের জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদের জ্ঞানের গুরুত্ব সর্বপ্রথম। তাই মানুষের ওপর আবশ্যক হলো, এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে যে, কীভাবে সে তাওহীদের জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং কোনো উৎস থেকে তা অর্জন করবে। প্রথমে সন্দেহ মুক্ত ও সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করবে। অতঃপর বিদ'আত ও সন্দেহ পূর্ণ বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করার পর সঠিক আকীদার আলোকে তার উত্তর দিবে। আকীদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবীগণের বক্তব্য অতঃপর তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীনে কেরাম এবং পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য আলিমগনের লেখনী ও বক্তব্য থেকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিমের নাম বিশেষভাবে

---

[75] ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম "আল ফিকহুল আক্বার"। গ্রন্থটিতে প্রচলিত ফিকহী মাসআলা সম্পর্কে কোনই আলোচনা নেই। বইটিতে কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হ তথা তাওহীদের বিষয় (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে) আলোচনা করা হয়েছে।

আফসোসের বিষয় এই যে, আমরা নিজেদেরকে হানাফী তথা ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করি। অথচ আমরা তাঁর গৃহীত আকীদার সাথে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষের আকীদার কোন সম্পর্ক নেই। -অনুবাদক।

[76] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ইলম।

উল্লেখযোগ্য।

মানুষ কি নিজ কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে স্বাধীন?

প্রশ্ন: (৬১) সম্মানিত শাইখ! আশা করি তাকদীরের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। মানুষের মূল কাজ কি পূর্ব নির্ধারিত এবং কাজটি পালন করার নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ কি স্বাধীন? উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো মানুষের জন্য যদি লেখা থাকে যে, সে একটি মসজিদ বানাবে। সে অবশ্যই মসজিদ বানাবে। তবে কীভাবে বানাবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। এমনিভাবে পাপ কাজ নির্ধারিত থাকলে তা অবশ্যই করবে। কীভাবে করবে তা নির্ধারিত হয় নি। মোটকথা মানুষের তাকদীরের যে সমস্ত কর্ম নির্ধারিত আছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন কথাটি কি ঠিক?

উত্তর: তাকদীরের মাসআলা নিয়ে বহু দিন যাবৎ মানুষের মাঝে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এ জন্যই মানুষ তাকদীরের মাসআলাকে কেন্দ্র করে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

১. এক শ্রেণির লোক বলে থাকে সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এতে মানুষের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা নেই। এদের মতে প্রচণ্ড বাতাসের কারণে ছাদে থেকে কোনো মানুষ নিচে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিড়ি বেয়ে নেমে আসা একই রকম।

২. অন্য একদলের মতে মানুষ তার কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক লিখিত ভাগ্যকে তারা সরাসরি অস্বীকার করে। তাদের মতে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন রূপে কর্ম সম্পাদন করে থাকে। ভাগ্য বলতে কিছু নেই।

৩. উভয় দলের মাঝখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আকীদা হলো, তাঁরা আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত তাকদীরে বিশ্বাস করেন। সাথে সাথে তারা কর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বান্দার স্বাধীনতাকে স্বীকার করেন। বান্দার কর্ম আল্লাহর নির্ধারণ এবং বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। ছাদে থেকে বাতাসের চাপে মাটিতে পড়ে যাওয়া এবং স্বেচ্ছায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার মাঝে মানুষ অবশ্যই পার্থক্য করতে জানে। প্রথমটিতে তার কোনো ইচ্ছা ছিলনা এবং দ্বিতীয়টি তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু উভয় কাজ আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। , তা সম্পর্কেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। শরী‘আতের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে তাকদীরের মাধ্যমে দলীল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা শরী‘আত বিরোধী কর্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় সে আল্লাহর নির্ধারণ সম্পর্কে অবগত থাকে না। স্বেচ্ছায় পাপ কাজের প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণেই দুনিয়া বা আখেরাতে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কাউকে পাপ কাজে বাধ্য করা হলে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। যেমন, একজন অন্য জনকে জোরপুর্বক মদ পান করিয়ে দিলে মদপানকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সে পান করে নি। মানুষ ভালো করেই জানে যে, আগুন থেকে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা এবং বসবাসের জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি নির্বাচন করা তার আপন পছন্দ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুন্দর ঘরবাড়ি নির্ধারণ এবং আগুন থেকে বাঁচার সুযোগ থাকা সত্বেও যে মানুষ সে সুযোগ গ্রহণ করে নি, তাকে সুযোগ নষ্ট করার জন্য তিরস্কার করা হয়। তবে

কী জন্যে সে পরকালের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার এবং জান্নাত আবশ্যককারী আমলগুলো ছেড়ে দেওয়াকে নিজের অপরাধ মনে করবে না?

বর্ণিত প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি কারও তাকদীরে লিখে রাখেন যে, সে একটি মসজিদ বানাবে, সে অবশ্যই মসজিদটি বানাবে, কিন্তু কীভাবে বানাবে সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এ উদাহরণটি ঠিক নয়। কেননা তাতে ধারণা করা হয় যে, নির্মাণের পদ্ধতি সম্পূর্ণ বান্দার হাতে। এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। সঠিক কথা এই যে, নির্মাণ করা এবং নির্মাণের পদ্ধতি সবই তাকদীরে নির্ধারিত। উভয়টি নির্বাচনে বান্দার স্বাধীনতা রয়েছে। তবে তাকে বাধ্য করা হয় নি। যেমনভাবে তাকে আপন ঘরবাড়ি নির্মাণ বা মেরামত করতে বাধ্য করা হয় নি। তাকদীর সম্পূর্ণ গোপন বিষয়। অহীর মাধ্যমে যাকে আল্লাহ অবগত করান সেই কেবল জানতে পারে। এমনিভাবে নির্মাণের পদ্ধতিও আল্লাহর নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সমস্ত জিনিসের বিবরণ বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাকদীরে লিখিত আছে।

আল্লাহ যে বিষয়ের ইচ্ছা করেন বা নির্ধারণ করেন, তা ব্যতীত বান্দার পক্ষে অন্য কিছু নির্বাচন করা সম্ভব নয়; বরং বান্দা যখন কোনো কিছু করে, তখন সে ভালো করেই জানে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সকল কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন আর বান্দা প্রকাশ্যভাবে তা সম্পাদন করে। বান্দা যখন কর্ম সম্পাদন করে, তখন সে অনুভবই করতে পারে না যে, কেউ তাকে কাজটি করতে বাধ্য

করছে। বাহ্যিক উপকরণের মাধ্যমে বান্দা যখন কাজটি করে ফেলে, তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

প্রশ্নে বর্ণিত মানুষের পাপ কাজের যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে আমরা তাই বলব, যা আমরা মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বলেছি। বান্দা কর্তৃক স্বেচ্ছায় কোনো কাজ নির্বাচন করা আল্লাহর নির্ধারণের পরিপন্থী নয়। কেননা কাজ করার জন্য বান্দা যখন অগ্রসর হয়, তখন সে সেচ্ছায় কাজটি নির্বাচন করেই অগ্রসর হয় এবং সে জানে না যে, কেউ তাকে কাজ করার জন্য বাধ্য করছে। কিন্তু যখন সে করে ফেলে, তখন সে জানতে পারে যে, আল্লাহ তার জন্যে কাজটি নির্ধারণ করেছেন। এমনিভাবে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া এবং তার প্রতি অগ্রসর হওয়া বান্দার নির্বাচনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটি তাকদীরের খেলাফ নয়। আল্লাহই সকল কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। সকল কর্ম বাস্তবায়নের উপকরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সকল কাজ সংঘটিত হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠﴾ [الحج: ٧٠]

“তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা আকাশে ও জমিনে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭০]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١١٢﴾ [الانعام: ١١٢]

"এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি মানুষ ও জিন্ন শয়তানদের। তারা ধোঁকা দেওয়ার জন্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ প্রবঞ্চনা মূলক কথা-বার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার রব চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১১২]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ قَتۡلَ أَوۡلَٰدِهِمۡ شُرَكَآؤُهُمۡ لِيُرۡدُوهُمۡ وَلِيَلۡبِسُواْ عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡۖ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١٣٧﴾ [الانعام: ١٣٧]

"এমনিভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাচারিতাকে পরিত্যাগ করুন।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৩৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعۡدِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

"আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিস্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গাম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করত না; কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফির। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পরে লড়াই করতো না, কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫২]

কোনো মানুষের উচিৎ নয় যে, নিজের ভিতরে বা অন্যের ভিতরে এমন কোনো জিনিসের অনুসন্ধান করা, যা অপরের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে এবং তাকদীরের মাধ্যমে শরী'আতের বিরোধীতা করার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবীদের আমল এ রকম ছিলনা। ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ﴾ الْآيَةَ»

“তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে লিখে দেওয়া হয় নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কি ভাগ্যের লেখার ওপর ভরসা করে বসে থাকব না এবং আমল বর্জন করব না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘না বরং তোমরা আমল কর। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তার জন্য দুর্ভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেওয়া হবে।’ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠﴾ [الليل: ٥، ١٠]

“অতএব, যে দান করে, আল্লাহ ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে। আমি তাকে সুখের বিষয়ের (জান্নাতের) জন্যে সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের (জাহান্নামের) জন্যে সহজ পথ দান করব”। [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]”[77]

উপরোক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগ্যের লিখনের ওপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। কারণ,

[77] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: তক্বদীর।

সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, তা জানার কোনো উপায় নেই এবং মানুষকে তার সাধ্যানুযায়ী আমল করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎ আমল করবে, তার জন্য কল্যাণের সহজ পথকে আরো সহজ করে দিবেন। এটিই ফলদায়ক ঔষধ। এর মাধ্যমেই বান্দা তার সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে এবং ঈমান আনার সাথে সাথে সৎ আমল করার জন্যে সদা স্বচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন সৎআমল করার তাওফীক দেন, ভালো পথ সহজ করে দেন, কঠিন পথ থেকে আমাদেরকে দূরে রাখেন এবং দুনিয়া-আখেরাতে ক্ষমা করেন।

প্রশ্ন: (৬২) সৃষ্টির পূর্বে মানুষের ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা কি দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব?

উত্তর: সন্দেহ নেই যে, ভাগ্যের লিখন পরিবর্তনে দো'আর প্রভাব রয়েছে। তবে জেনে রাখা দরকার, পরিবর্তনটাও পূর্বে লেখা আছে যে, দো'আর মাধ্যমে অমুকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এ ধারণা যেন না হয় যে, আপনি ভাগ্যের কোনো অলিখিত বস্তু পরিবর্তনের জন্যে দো'আ করছেন। সুতরাং দো'আ করবেন এটাও লেখা আছে। আর দো'আর মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তাও লিখিত আছে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা হলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈনিক কোনো একদিকে প্রেরণ করলেন। তারা কোনো এক গোত্রের নিকটে মেহমান হিসাবে উপস্থিত

হলে গোত্রের লোকেরা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। রাতের বেলা সেই গোত্রের নেতাকে বিষাক্ত সাঁপে দংশন করল। তাকে ঝাড়ার জন্য কবিরাজ অনুসন্ধান করা হলো, কিন্তু কোনো কবিরাজ পাওয়া গেল না। অবশেষে লোকেরা সাহাবীগণের নিকট এসে কবিরাজ অন্বেষণ করল। একজন সাহাবী বললেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে রাজি আছি, তবে আমাকে বিনিময় দিতে হবে। তারা একশটি ছাগল দিতে রাজি হলে উক্ত সাহাবী রোগীকে সূরা আল-ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করলেন। ফলে রোগী এমনভাবে সুস্থ হয়ে উঠল মনে হয় যেন রশির বাঁধন হতে মুক্ত করা হল।

উক্ত হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রোগ মুক্তর জন্য ঝাড়-ফুঁক যথেষ্ট কার্যকর। দো‘আর প্রভাব রয়েছে। তবে তাতে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না; বরং ভাগ্যে এটাও লেখা রয়েছে যে দো‘আ করবে তার ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। সব কিছুই সংঘটিত হয় ভাগ্যের লিখন অনুযায়ী।

প্রশ্ন: (৬৩) রিযিক এবং বিবাহ কি লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা যেদিন কলম সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুকাত সৃষ্টি হবে, সবই লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তা‘আলা কলম সৃষ্টি করে বললেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি লিখব? আল্লাহ তা‘আলা বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব লিখে ফেল। সে সময়

কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে, কলম সব কিছুই লিখে ফেলল।[78]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ভ্রুন মাতৃগর্ভে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা একজন ফিরিশতা প্রেরণ করেন। ফিরিশতা তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং লিখে দেন তার রিযিক, বয়স এবং তার কাজ অর্থাৎ সৌভাগ্যবান হবে না দুর্ভাগা হবে। রিযিক লিখা আছে এবং কীভাবে অর্জন করবে, তাও লিখা আছে। রিযিক অন্বেষণের সাথ সাথে রিযিক অন্বেষণের উপকরণও লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥﴾ [الملك: ١٥]

“তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তাতে বিচরণ কর এবং তার দেওয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]

রিযিক পাওয়ার এবং তা বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো, পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَه»

[78] মুসনাদে আহমাদ।

“যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হোক এবং বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”[79]

রিযিক বৃদ্ধির আরো মাধ্যম হলো তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ ۝٣﴾ [الطلاق: ٢، ٣]

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ বের করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন।” [সূরা আত-ত্বালাক, আয়াত: ২-৩]

এমন বলা যাবে না যে, রিযিক যেহেতু নির্ধারিত আছে সুতরাং আমি এর উপকরণ অনুসন্ধান করব না। এটা বোকামীর পরিচয়। বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো রিযিক এর জন্য এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ»

---

[79] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল বির ওয়াস সিলাহ।

“বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের হিসাব নিল এবং পরকালের জন্য আমল করল। অক্ষম ও নির্বোধ সেই ব্যক্তি, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে বসে থাকল।”[80]

রিযিক যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে, বিবাহ করাও নির্ধারিত রয়েছে। এ পৃথিবীতে কে কার স্বামী বা স্ত্রী হবে, তাও নির্দিষ্ট রয়েছে। আসমান-জমিনের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।

প্রশ্ন: (৬৪) মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার হুকুম কী?

উত্তর: বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার সময় মানুষ চার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা:

প্রথম স্তর: অসন্তুষ প্রকাশ করা। এটি আবার কয়েক প্রকার।

১ম প্রকার: আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ, এধরণের অসন্তুষ্টি কখনো কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ [الحج: ١١]

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদাতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি

---

[80] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ।

কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১১]

২য় প্রকার: কখনো অসন্তুষ্টি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দো'আ করা। এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকার: কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য্য ধারণের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় স্তর: বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা। যেমন, কোনো আরবী কবি বলেছেন 'বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা এ সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোটকথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الانفال: ٤٦]

"তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

তৃতীয় স্তর: বিপদ আসার পর সন্তুষ্ট থাকা এবং মুসীবত আসা ও না আসা উভয়কেই সমান মনে করা। তাই বিপদ আসলেও তার কাছে বিপদ সহ্য করা বেশি কঠিন মনে হয় না। গ্রহণযোগ্যমতে এ ধরণের ছবর মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এটা এবং পূর্ববর্তী স্তরের মাঝে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। বিপদ হওয়া এবং না হওয়া সমান মনে হওয়া সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ প্রকারের এবং পূর্বের প্রকারের মাঝে পার্থক্য এ যে, পূর্বের প্রকারে বিপদে আপতিত ব্যক্তি বিপদকে কঠিন মনে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে।

চতুর্থ স্তর: শুকরিয়া আদায় করা। এটা সর্বোচ্চ স্তর। তা এই যে, বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ, সে ভালো করেই জানে যে, এ সমস্ত বিপদাপদ গুনাহ মোচন এবং ছাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

“কোনো মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তা‘আলা তার গুনাহ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়”।[81]

[81] সহীহ বুখারী, কিতাবুল মারাজ্ব ওয়াত তিব্ব।

রোগ কি একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়?

প্রশ্ন: (৬৫) সম্মানিত শাইখ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, (لا عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر) **"একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয় না। পাখী উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। সফর মাসকেও অশুভ মনে করাও ঠিক নয়। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জানতে চাই। হাদীসে বর্ণিত জিনিসগুলোর প্রভাবকে অস্বীকার করা হয়েছে। এগুলো কোনো ধরণের অস্বীকার? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন কর যেভাবে তুমি বাঘ থেকে ভয়ে পলায়ন কর"। এ হাদীস ও প্রথমোক্ত হাদীসের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করব?**

উত্তর: একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হওয়াকে আদওয়া বলা হয়। শারীরিক রোগে যেমন এটা হয়, তেমনি চারিত্রিক রোগের ক্ষেত্রেও এমন হয়ে থাকে। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অসৎ বন্ধু কামারের ন্যায়। সে হয়ত তোমার জামা পুড়িয়ে ফেলবে। তা না হলে কমপক্ষে তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

কোনো জিনিস দেখে, কোনো কথা শুনে বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে করাকে 'ত্বিয়ারা' বলা হয়।

'হামাহ' এর ব্যাখ্যা দু'ধরণ হতে পারে।

ক) এমন রোগ, যা একজনকে আক্রমণ করে অন্যজনের নিকট সংক্রমিত হয়।

খ) ‘হামাহ’ বলা হয়, আরবদের ধারণামতে এমন এক শ্রেণির পাখিকে, যে গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেওয়ার উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ ধারণা করে যে, এটি নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। এ পাখিটিকে আমাদের পরিভাষায় হুতুম পেঁচা বলা হয়। তৎকালিন আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যু বরণ করবে।

‘সফর’ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(১) আরবী সফর মাস। আরবরা এ মাসকে অকল্যাণের মাস মনে করত।

(২) এটি উটের এক ধরণের রোগের নাম, যা এক উটের শরীর থেকে অন্য উটের শরীরে সংক্রমিত হয়।

(৩) সফর মাসকে আরবরা কখনো হারাম মাসের সাথে গণনা করত। আবার কখনো হালাল মাস হিসাবে গণ্য করত। এটি আরবদের গোমরাহী মূলক একটি আচরণ।

তবে উল্লিখিত ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য কথা হলো, জাহেলী সমাজের লোকেরা সফর মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করত। মূলতঃ

কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে সময় বা মাসের কোনো প্রভাব নেই। ছফর মাস অন্যান্য মাসের মতই। তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করতে গিয়ে কোনো কোনো মানুষ যখন ছফর মাসে কোনো কাজ সমাধা করে, তখন সেই তারিখ লিখে রাখে এবং বলে কল্যাণের মাস ছফর মাসের অমুক তারিখে কাজটি সমাধা হল। এটি এক বিদ‘আত দ্বারা অন্য বিদ‘আতের এবং এক অজ্ঞতা দ্বারা অন্য অজ্ঞতার চিকিৎসা করার শামিল। এটি কল্যাণের মাসও নয় এবং অকল্যাণের মাসও নয়। এ জন্যই কোনো কোনো বিদ্বান পেঁচার ডাক শুনে (خيرا ان شاء الله) “আল্লাহ চাহেতো ভালো হবে” এ কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। ভালো বা খারাপ কোনো কিছুই বলা যাবে না। সে অন্যান্য পাখির মতোই ডাকে।

উপরের চারটি বিষয়ের প্রভাবকে হাদীসে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহর ওপর ভরসা করা সকল মুমিনের ওপর আবশ্যক। এতে ঈমান মজবুত হবে। এ সমস্ত কুসংস্কারের সামনে মুমিন ব্যক্তি কখনো দুর্বল হবে না।

কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন এ সমস্ত বিষয়ের প্রভাবকে বিশ্বাস করবে, তখন নিম্নলিখিত দু’অবস্থার এক অবস্থা হতে পারেঃ

(১) সে হয়ত বিশ্বাস করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে অথবা থেমে যাবে। এ অবস্থায় তার কর্মসমূহ এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করল, যার কোনো প্রভাব নেই।

(২) কোনো কিছু পরওয়া না করে কাজের প্রতি অগ্রসর হবে, কিন্তু মনের ভিতরে দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তা থেকেই যাবে। কিন্তু এটি প্রথমটির চেয়ে হালকা। কারণ, সে এ সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে।

কিছু কিছু মানুষ শুভ-অশুভ নির্ধারণ করার জন্য কুরআন মাজীদ খুলে থাকে। খুলে জাহান্নামের আলোচনা দেখতে পেলে লক্ষণ ভালো নয় বলে মনে করে। আর জান্নাতের আলোচনা দেখতে পেলে খুশী হয়। এটি জাহেলী যামানার লোকদের কাজের মতই। যারা জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত জিনিসগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি। কারণ, এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে। তবে এগুলোর প্রভাবকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে নেন নি। আল্লাহই সকল বস্তুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। সুতরাং যদি জানা যায় যে, কোনো বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসাবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোনো ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোনো বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অসুস্থ

উটের মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়।”[82] সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকম বলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

“সিংহের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন কর, জুযাম (কুষ্ঠ) রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন কর”।[83]

আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»

“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫] এটা বলা যাবে না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের সংক্রমন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা বাস্তব অবস্থা ও অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে এ রকম ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে।

---

[82] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

[83] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

যদি বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, রোগ সংক্রামিত হয় না, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মরুভূমিতে সম্পূর্ণ সুস্থ উট বিচরণ করে। উটগুলোর কাছে যখন একটি খুজ্লিযুক্ত উট আসে, তখন সব উটই খুজ্লিযুক্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রথম উটটিকে কে খুজ্লিযুক্ত করল?[৮৪]

উত্তর হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি "প্রথমটিকে কে খুজলিযুক্ত করল?" এর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগের জীবানু অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমণ করে থাকে। তাই আমরা বলব যে, প্রথম উটের উপরে সংক্রামক ব্যতীত আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগ নাযিল হয়েছে। কোনো ঘটনার পিছনে কখনো প্রকাশ্য কারণ থাকে। আবার কখনো প্রকাশ্য কোনো করণ থাকে না। প্রথম উট খুজ্লিযুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উট খুজলিযুক্ত হওয়ার কারণ যদিও জানা যাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ চাইলে খুজলিযুক্ত হত না। তাই কখনো খুজলিতে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ভালোও হয়ে যায়। , কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা। একই ঘরের কয়েকজন আক্রান্ত হয়। কেউ মারা যায় আবার কেউ রেহাই পেয়ে যায়। মানুষের উচিৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করা। বর্ণিত আছে যে, 'একজন কুষ্ঠ রোগী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল। তিনি তার হাত ধরে

---

84 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

বললেন, আমার সাথে খাও।’[85] আল্লাহর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা থকার কারণেই তিনি তাকে খানায় শরীক করেছিলেন।

উপরের বিরোধপূর্ণ হাদীসগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে যা বলা হলো, তাই সর্বোৎকৃষ্ট। কেউ কেউ প্রশ্নের শেষোক্ত হাদীসকে মানসুখ বা রহিত বলেছেন। রহিত হওয়ার দাবী ঠিক নয়। কেননা রহিত হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে সমঝোতা করা সম্ভব না হওয়া। উভয় হাদীসের মধ্যে মিল দেওয়া সম্ভব হলে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হবে। আর রহিত হওয়ার দাবী করলে এক পক্ষের হাদীসের ওপর আমল বাতিল হয়ে যায়। এক পক্ষের হাদীসগুলো বাতিল করার চেয়ে উভয় পক্ষের হাদীসগুলোর ওপর আমল করাই উত্তম।

[85] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

বদ নজরের প্রকৃতি কী এবং তার চিকিৎসা কী?

প্রশ্ন: (৬৬) মানুষের ওপর কি বদ নজর লাগে? লাগলে তার চিকিৎসা কী? এ থেকে বেঁচে থাকা কি আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী?

উত্তর: বদ নজরের প্রভাব সত্য। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزۡلِقُونَكَ بِأَبۡصَٰرِهِمۡ﴾ [القلم: ٥١]

“কাফেরেরা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে চায়।” [সূরা আল-ক্বলম, আয়াত: ৫১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا»

“বদ নজরের প্রভাব সত্য। কোনো জিনিস যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত, তাহলে বদ নজর তাকে অতিক্রম করত। তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে এবং গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবে।”[86]

নাসাঈ এবং ইবন মাজাহতে বর্ণিত আছে যে, একদা আমের ইবন রাবিয়া সাহল ইবন হুনাইফের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সাহল ইবন হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তখন গোসল করতে ছিলেন। আমের

[86] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস্ সালাম।

ইবন রাবীয়া সাহলকে দেখে বলল, আমি আজকের মত লুকায়িত সুন্দর চামড়া আর কখনো দেখি নি। এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর সাহ্ল অসুস্থ হয়ে পড়ে গেল। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসে বলা হলো, সাহল বদ নজরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা কাকে সন্দেহ করছ? তারা বলল, আমের ইবন রাবীয়াকে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন তোমাদের কেউ তার ভাইকে হত্যা করতে চায়। কেউ যদি কারো মধ্যে ভালো কিছু দেখে, তাহলে সে যেন তার জন্য ভাই এর কল্যাণ কামনা করে এবং দো'আ করে। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমেরকে অযু করতে বললেন। অযুতে মুখমণ্ডল, কনুইসহ উভয় হাত এবং হাটু পর্যন্ত এমনকি লুঙ্গীর নীচ পর্যন্ত ধৌত করে সাহলের শরীরে ঢালতে বললেন।[87] কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় পানির পাত্র যেন পেছন থেকে ঢালে। এটি বাস্তব ঘটনা, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

বদ নজরে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা হলো:

(১) হাদীসে বর্ণিত দো'আগুলো পাঠ করে আক্রান্ত রোগীর উপর ঝাড়-ফুঁক করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»

[87] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

“বদ নজর এবং বিচ্ছুর বিষ নামানোর ঝাঁড়-ফুঁক ব্যতীত কোনো ঝাড়-ফুঁক নেই।”[88]

জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দো‘আর মাধ্যমে ঝাড়তেন,

«بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

“আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি প্রতিটি এমন জিনিস হতে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক জীবের অমঙ্গল হতে ও হিংসুকের বদ নজর হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে ঝাড়-ফুঁক করছি।”[89]

(২) যার বদ নজর লাগছে বলে সন্দেহ করা হয়, তাকে গোসল করিয়ে গোসলের পানি রোগীর শরীরে ঢালতে হবে। যেমনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমের ইবন রাবীয়াকে গোসল করতে বলেছিলেন। সন্দেহ যুক্ত ব্যক্তির পেশাব-পায়খানা বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে চিকিৎসা করার কোনো দলীল নেই। অনুরূপভাবে তার উচ্ছিষ্ট বা অযুর পানি ইত্যাদি ব্যবহার করাও ভিত্তিহীন। হাদীসে যা পাওয়া যায় তা হলো তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং লুঙ্গির নিচের অংশ ধৌত করা এবং সম্ভবতঃ

---

[88] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত্ তিবব।

[89] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস্ সালাম।

মাথার টুপি, পাগড়ী বা পরিধেয় কাপড়ের নিচের অংশ ধৌত করা এবং তা ব্যবহার করাও বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

বদ নজর লাগার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়াতে কোনো দোষ নেই। এটা আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিপন্থীও নয়। কারণ, আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে ভরসার স্বরূপ হলো বান্দা বৈধ উপকরণ অবলম্বন করে বদনজর ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে এবং সেই সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে এ বাক্যগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন:

«أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

"আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে প্রতিটি শয়তান এবং বিষধর বস্তু ও কষ্ট দায়ক নযর হতে তোমাদের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি।"[90]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এ দো'আর মাধ্যমে ঝাড়-ফুক করতেন।[91]

প্রশ্ন: (৬৭) আকীদার মাসআলায় কি অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য?

---

[90] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ।

[91] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নবীদের হাদীস।

উত্তর: আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণ করা হবে কি না এ বিষয়টি অন্যান্য ফিক্হী মাসআলার ন্যায় মতবিরোধপূর্ণ। ব্যক্তি বিশেষের উপর বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এ মতভেদ শাব্দিক হতে পারে। অর্থাৎ বিদ্বানগণ একমত যে, কোনো একটি কথা বা কাজ করা বা ছেড়ে দেওয়াটা কুফুরী। কুফুরীতে লিপ্ত হলো, নির্দিষ্টভাবে তার ওপর কি কুফুরীর বিধান প্রযোজ্য হবে? কেননা সেখানে কুফুরীর শর্তসমূহ বিদ্যামান এবং কাফির না হওয়ার প্রতিবন্ধতা নেই। না কি কাফির হওয়ার দাবী অবর্তমান থাকায় বা কাফির হওয়ার কোনো প্রতিবন্ধক থাকায় উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা প্রযোজ্য হবে না? এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেসমস্ত কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায় সেগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা দু'ধরণের হতে পারে।

(১) এমন ব্যক্তি থেকে কুফুরী প্রকাশ পাওয়া, যে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারী অথবা সে কোনো দীনই বিশ্বাস করে না এবং সে এটা কোনো সময় কল্পনাও করতে পারে নি যে, সে যে বিষয়ের ওপর রয়েছে, তা ইসলাম বহির্ভুত। এ ব্যক্তির ওপর দুনিয়াতে কাফিরের বিধান প্রয়োগ করা হবে। আখেরাতের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো, আল্লাহ পরকালে তাকে যেভাবে পরীক্ষা করবেন। তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন; কিন্তু আমরা এ কথা ভালো করেই জানি যে, বিনা অপরাধে কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩]

“আপনার রব কাউকে যুলুম করবেন না।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৪৯]

দুনিয়াতে তার ওপর কুফুরীর বিধান প্রয়োগ হওয়ার কারণ এই যে, সে ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নি। তাই তার ওপর ইসলামের বিধান প্রয়োগ হবেনা। পক্ষান্তরে আখেরাতে তাকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. তার রচিত “তরীকুল হিজরাতাইন” নামক বইয়ে মুশরিক শিশুদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন।

(২) এমন লোক থেকে কুফুরী প্রকাশ পাওয়া, যার ধর্ম ইসলাম, কিন্তু সে এ কুফুরী আকীদা নিয়ে বসবাস করছে অথচ সে জানে না যে, এ আকীদা ইসলাম বিরোধী। কেউ তাকে সতর্কও করে নেই। মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। পরকালের বিষয়টি আল্লাহর হাতে। কুরআন, সুন্নাহ এবং আলিমদের বাণী থেকে এ মর্মে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾ [الاسراء: ١٥]

“রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেব না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبۡعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولٗا يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِنَاۚ وَمَا كُنَّا مُهۡلِكِي ٱلۡقُرَىٰٓ إِلَّا وَأَهۡلُهَا ظَٰلِمُونَ ٥٩﴾ [القصص: ٥٩]

“আপনার রব জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء: ١٦٥]

“সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি ওজুহাত বা যুক্তি খাড়া করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫]

আল্লাহ বলেন

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ﴾ [ابراهيم: ٤]

“আমি সব রাসূলকেই তাদের জাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কারভাবে বোঝাতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তা‘আলা সূরা তাওবায় বলেন,

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَۚ﴾ [التوبة: ١١٥]

“আর আল্লাহ কোনো জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেন সে সব বিষয়, যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيۡنِ مِن قَبۡلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَٰفِلِينَ ١٥٦ أَوۡ تَقُولُواْ لَوۡ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيۡنَا ٱلۡكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهۡدَىٰ مِنۡهُمۡۚ فَقَدۡ جَآءَكُم بَيِّنَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞۚ ١٥٧﴾ [الانعام: ١٥٥، ١٥٧]

“এটি এমন একটি বরকতময় গ্রন্থ, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর, যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু’টি সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কিংবা এ কথা বলতে না পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা তাদের চাইতে অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অবশ্যই তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসে গেছে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৫-৫৭]

এমনি আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, মানুষের কাছে দীনের শিক্ষা দান ও তা বর্ণনা করার পূর্বে হুজ্জত কায়েম হবে না।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

“ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এ উম্মাতের কোনো ইয়াহূদী বা নাসারা আমার কথা শুনে আমার আনিত বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন না করে মারা গেলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।”[92]

আলেমগণ বলেন, কোনো নও মুসলিম বা অমুসলিম দেশে বসবাসকারী বা মুসলিমদের এলাকা থেকে দূরবর্তী স্থানের অধিবাসী হওয়ার কারণে কেউ যদি কুফুরী কাজে লিপ্ত হয়, তাকে কাফির হওয়ার ফাতওয়া দেওয়া যাবে না।[93] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন, যারা আমাকে চেনে, তারা অবশ্যই জানে যে, নির্দিষ্টভাবে কাউকে কাফির বা ফাসিক বলা থেকে আমি কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি। তবে যে ব্যক্তি কাফির বা ফাসিক হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত আছে, তার কথা ভিন্ন। আমি আবারও বলছি যে, এ উম্মতের কেউ ভুলক্রমে অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। চাই আকীদার মাসআলায় ভুল করুক কিংবা অন্য কোনো মাসআলায়। সালাফে সালেহীন অনেক মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তারপরও

---

[92] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

[93] মুগনী ৮/১৩১

কেউ কাউকে কাফির বলেন নি। তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে, সে কাফির হয়ে যাবে, এটা ঠিক, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট কর্মের উপরে হুকুম লাগানো এবং ব্যক্তির ওপর হুকুম লাগানোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, কাউকে কাফির বলা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। করা হয়েছে।, , সে নও মুসলিম অথবা সে আলিম-উলামা থেকে দূরের কোনো জনপদে বসবাস করছে। যার কারণে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারেনি। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে দীনের কোনো বিষয় অস্বীকার করলেই তাকে কাফির বলা যাবে না। যতক্ষণ না তার কাছে হুজ্জত (কুরআন-সুন্নাহর দলীলসমূহ) পেশ করা হবে। এও হতে পারে যে, সে দলীল-প্রমাণ শুনে নি অথবা শুনেছে কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে তার কাছে পৌঁছে নি। কখনো এও হতে পারে যে, সে একজন আলিম। তার কাছে দলীল রয়েছে বা দলীলের ব্যাখ্যা রয়েছে। যদিও তা সঠিক নয়।[94]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব রহ. বলেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলি, যে দীনে মুহাম্মাদী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে গালি-গালাজ করল। শুধু তাই নয় বরং মানুষকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত রাখে এবং ধার্মিক লোকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। আমি এ শ্রেণির লোকদেরকে কাফির বলে থাকি।[95] তিনি আরো বলেন, যারা বলে আমরা ব্যাপকভাবে মানুষকে কাফির বলি এবং দীন পালনে

---

[94] মাজমূআয়ে ফাতোয়া ইবন তাইমীয়াঃ ৩/৩৩৯।

[95] আদ্ দুরারুস সানীয়া ১/৫৬।

সক্ষম ব্যক্তিকেও আমাদের কাছে হিজরত করে চলে আসতে বলি, তারা অপবাদ প্রদানকারী মিথ্যুক। তারা মানুষকে আল্লাহর দীন গ্রহণ করতে বাঁধা দিয়ে থাকে। আবদুল কাদের জিলানী এবং সায়্যেদ আহমদ বাদভীর কবরের উপরে যে মূর্তি রয়েছে, তার উপাসকদেরকে যদি অজ্ঞতার কারণে এবং তাদেরকে কেউ সতর্ক না করার কারণে কাফির না বলি, তাহলে কীভাবে আমরা এমন নির্দোষ লোকদেরকে আমাদের দিকে হিজরত না করার কারণে কাফির বলব, যারা কখনো আল্লাহর সাথে শরীক করে নি এবং আমাদেরকে কুফর প্রতিপন্ন করে নি ও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে নি?[96]

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং আলিমদের কথা অনুযায়ী দলীল-প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত কাউকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দাবীও তাই। তিনি অযুহাত পেশ করার সুযোগ দূর না করে কাউকে শাস্তি দিবেন না। বিবেক দ্বারা মানুষের ওপর আল্লাহর হক সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। যদি তাই হত, তাহলে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে হুজ্জত পেশ করা যথেষ্ট হত না।

সুতরাং একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম হিসেবেই পরিগণিত হবে, যতক্ষণ না শরী‘আতের দলীলের মাধ্যমে তার ইসলাম ভঙ্গ হবে। কাজেই কাফির বলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, তা না হলে দু’টি বড় ধরণের ভয়ের কারণ রয়েছে।

---

[96] আদ দুরারুস সানীয়া ১/৬৬।

(১) আল্লাহর ওপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ। সাথে সাথে যার ওপর হুকুম লাগানো হলো তাকেও এমন দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হলো, যা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহর ওপর মিথ্যাচারিতার অপবাদ এভাবে হয় যে, এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ কাফির বলেন নি। এটি আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম করার শামিল। কেননা কাউকে কাফির বলা বা না বলা এটি কেবল আল্লাহরই অধিকার। যেমনিভাবে কোনো কিছু হারাম করা বা হালাল করার দায়িত্ব আল্লাহর উপরে।

(২) দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো মুসলিম ব্যক্তি যে অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তার বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। কেননা যখন কোনো মুসলিমকে লক্ষ্য করে কাফির বলবে, তখন সে যদি কাফির না হয়, তাহলে ফাতওয়া দানকারী নিজেই কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»

“যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলবে, তখন তাদের দু’জনের একজন কাফিরে পরিণত হবে।”[97]

---

[97] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যাকে কাফির বলা হলো, সে যদি কাফির হয়ে থাকে তাহলে কাফির হবে। অন্যথায় ফাতওয়া দানকারী নিজেই কাফেরে পরিণত হবে।[98]

সহীহ মুসলিমে আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

«وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কাফির বলবে অথবা আল্লাহর শত্রু বলবে, সে অনুরূপ না হয়ে থাকলে যে বলল সে নিজেই কাফির বা আল্লাহর শত্রু হিসাবে পরিণত হয়ে যাবে।"[99]

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে কাফির বলে, সে নিজের আমল নিয়ে অহংকার করে এবং অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে। এ ধরণের ব্যক্তি দু'টি সমস্যার সম্মুখীন। নিজের আমলকে খুব বড় মনে করলে আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার মধ্যে অহংকার আসার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»

[98] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

[99] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

“আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর। বড়ত্ব আমার পোষাক। যে ব্যক্তি আমার এ দু’টির যে কোনো একটি পোষাক নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।”[100] সুতরাং কাউকে কাফির বলার পূর্বে দু’টি বিষয় খেয়াল করতে হবে:

(১) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নায় কাজটিকে কুফুরী বলা হয়েছে কি না। যাতে করে আল্লাহর ওপর মিথ্যাচারিতায় লিপ্ত না হয়।

(২) যার ভিতরে কাফির হওয়ার কারণ ও শর্তসমূহ বিদ্যমান এবং কাফির না হওয়ার যাবতীয় বাঁধামুক্ত। কেবল তার উপরই কুফুরীর বিধান প্রয়োগ করা। কাফির হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, জেনে-শুনে শরী‘আত বিরোধী এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা কুফুরীকে আবশ্যক করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥﴾ [النساء: ١١٥]

“আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তন করাবো, যাতে সে প্রত্যাবর্তন করতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর ওটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫]

---

[100] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুল লিবাস।

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার শর্ত হলো হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধিতা করা।

কাজটি করলে কাফির হয়ে যাবে, এটা জানা কি জরুরি? নাকি কাজটি শরী'আতে নিষেধ এতটুকু জানাই যথেষ্ট? যদিও কাজটির ফলাফল সম্পর্কে অবগত না থাকে।

উত্তর হলো, কাজটি শরী'আতে নিষেধ একথা জেনে তাতে লিপ্ত হলেই হুকুম লাগানোর জন্য যথেষ্ট। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে এক লোকের ওপর কাফফরা ওয়াজিব করেছিলেন। কারণ, সে জানতো দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম; কিন্তু কাফফরা ওয়াজিব হওয়ার কথা জানতো না। বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারকে হারাম জেনে তাতে লিপ্ত হলে তাকে রজম করতে হবে। যদিও সে বিবাহিত যেনাকারীর শাস্তি যে রজম, তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

জোর পূর্বক কাউকে কুফুরী কাজে বাধ্য করা হলে, তাকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [النحل: ١٠٦]

“কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফুরীতে লিপ্ত হলে এবং কুফুরীর জন্য অন্তরকে খুলে দিলে তার ওপর আপততি হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্যে রয়েছে মহা শাস্তি। তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফুরীর জন্যে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০৬]

অধিক আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে বা চিন্তিত অবস্থায় অথবা রাগান্বিত হয়ে অথবা ভীত অবস্থায় কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হয়ে যাবে না। আল্লাহর বাণী,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥]

“ভুলক্রমে কোনো অপরাধ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ»

“গুনাহ করার পর বান্দা যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ তা‘আলা ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি খুশী হন, যে একটি বাহনের উপর আরোহন করে মরুভূমির উপর দিয়ে পথ চলতে ছিল। এমন সময় বাহনটি তার খাদ্য-পানীয় সব নিয়ে পলায়ন করল। এতে লোকটি নিরাশ হয়ে একটি গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ নিদ্রায় থাকার পর হঠাৎ উঠে দেখে বাহনটি তার সমস্ত আসবাব পত্রসহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে বলে উঠল, হে আল্লাহ! আপনি আমার গোলাম, আমি আপনার রব। খুশীতে আত্মহারা হয়েই সে এ ধরণের ভুল করেছে।”[101]

কাফির বলার পথে আরেকটি বাধা হলো কাজটি কুফুরী হওয়ার ব্যাপারে কুফুরীতে লিপ্ত ব্যক্তির কাছে তাবীল বা ব্যাখ্যা থাকা। যে কারণে সে মনে করে যে, সে সত্যের ওপরই আছে। কাজেই সে তার ধারণা মতে পাপ বা শরী‘আত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয় নি। আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥]

“ভুলক্রমে কোনো অপরাধ করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

---

[101] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত তাওবাহ।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

ইমাম ইবন কুদামা আল-মাকদেসী বলেন, কোনো প্রকার সন্দেহ বা ব্যাখ্যা ব্যাতীত কেউ যদি নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হালাল ভেবে হত্যা করে এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি তাবীল করে কাফির ভেবে হত্যা করে এবং সম্পদ হালাল জেনে আত্মসাৎ করে, তবে তাদেরকে কাফির বলা হবে না। এ জন্যে খারেজীদেরকে অধিকাংশ আলিমগণ কাফির বলেন নি। অথচ তারা মুসলিমদের জান-মাল হালাল মনে করে এবং এ কাজের দ্বারা তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে বলে মনে করে। তাদেরকে কাফির না বলার কারণ এই যে, তারা তাবীল বা অপব্যাখ্যা করে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছিল। তিনি আরো বলেন, খারেজীরা অনেক ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীদের রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করত। শুধু তাই নয় এ কাজকে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম মনে করত। তা সত্বেও আলিমগণ তাদেরকে কাফির বলেন নি। কারণ, তাদের কাছে অপব্যাখ্যা ছিল।[102]

[102] খারেজীর বিশ্বাস এই যে, কোন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যায় এবং তার জান-মাল হালাল হয়ে যায়।

ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, কুরআনের বিরোধীতা করা খারেজীদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং কুরআন বুঝতে গিয়ে ভুল করার কারণে তারা বিদ‘আতে লিপ্ত হয়ে পাপী মুমিনদেরকে কাফির মনে করেছে।[103] তিনি আরো বলেন, খারেজীরা কুরআনের বিরোধীতা করে মুমিনদেরকে কাফির বলেছে। অথচ কুরআনের ভাষায় মুমিনদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তারা বিনা ইলমে, সুন্নার অনুসরণ না করে এবং প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে না গিয়ে কুরআনের অস্পষ্ট আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করেছে। তিনি আরো বলেন, ইমামগণ ঐক্যবদ্ধভাবে খারেজীদেরকে নিন্দা করেছেন এবং গোমরাহ বলেছেন। তবে তাদেরকে কাফির বলার ক্ষেত্রে দু’টি বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলেন নি; বরং তাদেরকে যালেম এবং সীমা লংঘনকারী মুসলিম হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল ও অন্যান্য ইমামগণ থেকেও এ ধরণের কথা বর্ণিত আছে। ইমাম ইবন তাইমীয়া আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন। চতুর্থ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সাহাবী ও পরবর্তী উত্তম যুগের ইমামগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, সা‘দ ইবন আবি ওয়াক্কাস বা অন্য কোনো সাহাবী খারেজীদেরকে কাফির বলেন নি; বরং তাদেরকে

[103] মাজমূআ‘ ফাতওয়া ইবন তাইমিয়া ১৩/৩০।

মুসলিম মনে করেছেন। তারা যখন অন্যায়ভাবে মানুষের রক্তপাত শুরু করল এবং মুসলিমদের ধন-সম্পদের ওপর আক্রমণ করল তখন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের এ যুলুম এবং বিদ্রোহ দমন করার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে কাফির মনে করে যুদ্ধ করেন নি। তাই তিনি তাদের মহিলাদেরকে দাসী হিসাবে বন্দী করেন নি এবং তাদের সম্পদকে গণীমত হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাদের গোমরাহী কুরআনের দলীল, মুসলিমদের ইজমা‘ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন। তথাপিও আলিমগণ তাদেরকে কাফির বলেন নি। তাহলে কীভাবে এমন ফিরকার লোকদেরকে কাফির বলবেন, যাদের চেয়ে বড় আলিমগণ অনেক মাসআলায় ভুল করেছেন। সুতরাং এক দলের পক্ষে অপর দলকে কাফির বলা এবং জান-মাল হালাল মনে করা জায়েয নেই। যদিও তাদের ভিতরে বিদ‘আত বর্তমান রয়েছে। মূল কথা তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে সে সম্পর্কে তারা সকলেই অজ্ঞ। ’বীল করে কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বা কাউকে কাফির বলে, তবে উক্ত মুসলিমকে কাফির বলা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী থেকে যে হুকুম সাব্যস্ত হয়, দাওয়াত না পৌঁছিয়ে বান্দার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের আলিমগণের তিন ধরণের বক্তব্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কুরআনের বক্তব্যই সঠিক। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾ [الاسراء: ١٥]

“রাসূল না পাঠিয়ে আমরা কাউকে শাস্তি দেব না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১৫]

﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء: ١٦٥]

“সুসংবাদ দাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অযুহাত পেশ করার মত কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৬৫]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, আল্লাহর চেয়ে অধিক ওযর-অযুহাত গ্রহণকারী আর কেউ নেই। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূল প্রেরণ করেছেন।

মোটকথা অজ্ঞতার কারণে কেউ কুফুরী করলে অথবা কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে কাফির হবে না। , রাসূলের সুন্নাত এবং আলিমদের পথ।

প্রশ্ন: (৬৮) যারা আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হুকুম কী?

উত্তর: আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলছি যে, আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালানো বা বিচার-ফয়সালা করা তাওহীদে রুবূবীয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত, পরিপূর্ণ রাজত্ব এবং পরিচালনা ক্ষমতার দাবী অনুযায়ী তাঁর হুকুম কার্যকর করার নামান্তর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহকেও অথচ তাদের প্রতি শুধু এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদাত করবে, যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউ নয়। তিনি তাদের অংশী স্থাপন করা হতে পবিত্র।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী-নাসারাদের ধর্ম-যাজকদেরকে রব হিসেবে নাম করণ করেছেন। কারণ, তারাও আল্লাহর বিধানের মত বিধান রচনা করত। তাদের রচিত বিধানের অনুসারীদেরকে গোলাম বা বান্দা হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে। কারণ, তারা আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করে ঐ সব পাদ্রি ও আলিমদের কাছে নতি স্বীকার করত এবং তাদের অনুসরণ করত। আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, তারা তো তাদের ইবাদাত করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা হালালকে হারাম করে এবং হারামকে হালাল করে। আর সাধারণ লোকেরা তাদের অনুসরণ করে থাকে। এটার নামই ইবাদাত।[104]

আপনি জেনে নিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না; বরং অন্যের বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তাদের ব্যাপারে

[104] তিরমিযী, অধ্যায়: তাফসীরুল কুরআন।

কুরআনের আয়াতগুলো দু’ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের আয়াতে তাদেরকে ঈমানহীন (মুনাফিক) দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতে কাফির, যালেম ও ফাসিক বলা হয়েছে। ,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ۝٦٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝٦١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ۝٦٢ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ۝٦٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝٦٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ۝٦٥﴾ [النساء: ٦٠، ٦٥]

“আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সে সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য শয়তানের কাছে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, তোমরা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান এবং তাঁর রাসূলের দিকে এসো তখন আপনি মুনাফিকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে

সম্পূর্ণভাবে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিপদ আরোপিত হয়, তখন কেমন হবে? অতঃপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, কল্যাণ ও সমঝোতা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত। অতএব, আপনি ওদেরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনো কথা বলুন, যা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের (রাসূলগণের) আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবান রূপে পেত। অতএব, তোমার রবর কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবূল করে নিবে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০-৬৫]

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন:

(১) মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য গমণ করে থাকে। প্রত্যেক ঐ বিষয় বা ব্যক্তির নামই

তাগুত, যে আল্লাহর বিধানের বিরোধীতা করে। সমস্ত বিচার-ফায়সালা এবং হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। বলেন,

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الاعراف: ٥٤]

“জেনে রাখ! তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ করা। আল্লাহ বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের রব।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]

(২) তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আহ্বান করা হলে তারা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৩) তারা কোনো বিপদে পড়লে অথবা তাদের কৃতকর্ম মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেলে শপথ করে বলে থাকে যে, সৎ উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বর্তমানে যারা ইসলামের বিধান বাদ দিয়ে বানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র চালায়, তাদের কথাও একই রকম। তারা বলে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের উপকার সাধন করা।

আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী মুনাফেকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরের খবর জানেন এবং তাদেরকে নসীহত করার জন্য এবং কঠোর ভাষায় কথা বলার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, যাতে শুধুমাত্র তাঁদেরই অনুসরণ করা হয়। অন্য মানুষের অনুসরণ নয়। তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদ যতই

শক্তিশালী হোক না কেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের রুবূবীয়্যাতের শপথ করে তাঁর রাসূলকে বলছেন যে, তিনটি বিষয়ের সমন্বয় ব্যতীত কারও ঈমান সংশোধন হবে না।

1) সকল প্রকার বিরোধপূর্ণ বিষয়ে রাসূলের দিকে ফিরে আসা।
2) রাসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার জন্য অন্তরকে প্রশস্ত করা।
3) পরিপূর্ণভাবে রাসূলের ফায়সালাকে মেনে নেওয়া এবং কোনো প্রকার শীথিলতা ব্যতীত তা বাস্তবে রূপদান করা।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৪]

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা যালেম।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৫]

﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা ফাসিক।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৭]

যারা আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে না তাদেরকে আল্লাহ উপরের তিনিটি আয়াতে পরপর কাফির, যালেম এবং ফাসিক বলেছেন। তিনটি

গুণই কি এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করল না, সে কাফির, ফাসিক এবং যালেমও বটে। কেননা আল্লাহ কাফিরদেরকে যালেম এবং ফাসিক হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]

"বস্তুতঃ কাফিররাই প্রকৃত যালেম।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৪]

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]

"তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৮৪]

প্রত্যেক কাফির-ই কি যালেম এবং ফাসিক? নাকি আল্লাহর আইন দিয়ে ফায়সালা না করার কারণে বিভিন্ন প্রকার মানুষের ওপর অবস্থাভেদে এ সমস্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় মতটি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার না করলে মানুষ কখনো কাফির হয়, কখনো যালেম হয় আবার অবস্থাভেদে কখনো ফাসিক হয়।

সুতরাং আমরা বলব যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ মনে করে এবং অন্য বিধানকে অধিক উপযোগী ও উপকারী মনে করে তার মাধ্যমে মানুষের বিচার-ফায়সালা করে, তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। এদের অন্তর্ভুক্ত ঐ সমস্ত লোক, যারা

মানুষের জন্য পথ হিসাবে ইসলাম বিরোধী বিধান রচনা করে। তারা তাদের রচিত বিধানকে মানুষের জন্য অধিক উত্তম ও উপযোগী মনে করেই তৈরি করে থাকে। এ কথা স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, মানুষ এক পথ ছেড়ে দিয়ে যখন অন্য পথে চলে, তখন এটা মনে করেই চলে যে, প্রথম পথের চেয়ে দ্বিতীয় পথটি উত্তম।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং বিচার-ফায়সালা করে, কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না; বরং সে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এরূপ করে থাকে, তাহলে কাফির হবে না বরং যালেম হিসাবে গণ্য হবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য বিধানের মাধ্যমে রাষ্টীয় বিচার-ফায়সালা করে কিন্তু সে আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা করে না এবং অন্য বিধানকে অধিক উপকারী এবং উপযোগীও মনে করে না, বরং বিচার প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ঘুষ গ্রহণের জন্য কিংবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য এরূপ করে থাকে, তা হলে কাফির হবে না; বরং ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলিমদেরকে রব (প্রভু) হিসেবে গ্রহণ করে, তারা দু'প্রকার।

(১) তারা জানে যে, তাদের গুরুরা আল্লাহর দীন পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারপরও তারা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের হালাল

করা বস্তুকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে তাদের নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে। তারা ভালো করেই জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলদের আনীত দীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফুরী। এটাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল শির্ক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।

(২) তারা কেবল হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে। তারা আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের নেতাদের অনুসরণ করেছে। যেমনভাবে মুসলিমগণ হারাম জেনেও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের হুকুম অন্যান্য পাপীদের মতোই।

গাইরুল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করা বড় শির্ক।

প্রশ্ন: (৬৯) গাইরুল্লাহর নৈকট্য হাসিলের জন্য পশু কুরবানী করার হুকুম কী? গাইরুল্লাহর নামে যবাই করা পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েয আছে কী?

উত্তর: গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যবাই করা একটি ইবাদাত। তা'আলা এ মর্মে আদেশ দিয়ে বলেন,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾ [الكوثر: ٢]

“আপনার রবের জন্য সালাত পড়ুন এবং কুরবানী করুন।” [সূরা আল-কাউসার, আয়াত: ২]

﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٦٣﴾ [الانعام: ١٦٢، ١٦٣]

“আপনি বলুন! আমার সালাত, আমার সমস্ত ইবাদাত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি এর জন্যে আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।” [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পশু যবাই করবে, চাই সে কোনো ফিরিশতার উদ্দেশ্যে করুক বা নবী-রাসূলের উদ্দেশ্যে বা কোনো

ওলী বা আলিমের উদ্দেশ্যে করুক, সবই শির্কে পরিণত হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির উচিৎ এ ধরণের শির্কে লিপ্ত না হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম, আর এরূপ অত্যাচারীদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী হবে না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

গাইরুল্লাহর জন্যে যবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। যেমন, আল্লাহ বলেন,

﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]

"তোমাদের জন্যে মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গকৃত পশু, গলাটিপে মারা পশু, প্রহারে মৃত পশু, উপর থেকে পতিত হয়ে মারা যাওয়া পশু, অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা পশুর গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবাই দ্বারা পবিত্র করেছ, তা হালাল। আর যে সমস্ত

পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয়েছে, তাও তোমাদের জন্য হারাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

প্রশ্ন: (৭০) আল্লাহ বা তাঁর রাসূল অথবা দীন নিয়ে হাসি ঠাট্টা করার হুকুম কী?

উত্তর: এ কাজটি অর্থাৎ আল্লাহ বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কুরআন অথবা দীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা কুফুরী। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ রকম বিদ্রুপের ঘটনা ঘটেছিল। একদা মুনাফিকরা তাঁকে এবং সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলল, আমরা এ সমস্ত লোকদের চেয়ে অধিক পেট পূজারী, অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের চেয়ে অধিক ভীতু আর কাউকে দেখি নি। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُۚ﴾ [التوبة: ٦٥]

“আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা কেবল হাসি-তামাসা করছিলাম।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন অভিযোগ আসল, তখন তারা বলল, পথের ক্লান্তি দূর করার জন্য যে সমস্ত কথা-বার্তা বলা হয়, আমরা শুধু তেমন কিছু কথাই বলছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিলেন।

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ۞ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ ۞﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“বলুন! তোমরা কি আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা এখন ওযর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান প্রকাশের পর কুফুরী করেছো।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]

কাজেই আল্লাহ তা‘আলা, রিসালাত, অহী এবং দীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলোর কোনো একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শরী‘আতকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরণের কাজ করবে, তাদের উচিৎ আ,ল্লাহর দরবারে তাওবা করে এবং ক্ষমা চেয়ে নিজেকে সংশোধন করা। তাদের উচিৎ আল্লাহর প্রতি ভয় ও সম্মান দিয়ে অন্তরকে পরিপূর্ণ করা।

প্রশ্ন: (৭১) কবরবাসীর কাছে দো‘আ করার বিধান কী?

উত্তর: দো‘আ করা দু’প্রকারঃ

(১) ইবাদাতের মাধ্যমে দো‘আ। , সালাত, সাওম এবং অন্যান্য ইবাদাত। সালাত আদায় করে কিংবা সাওম রাখে, তখন সে প্রভুর কাছে উক্ত ইবাদাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়। আল্লাহর বাণী,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠﴾ [غافر: ٦٠]

“তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। যারা অহংকার করতঃ আমার ইবাদাত হতে বিমুখ হবে, তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ তা‘আলা দো‘আকে ইবাদাত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবাদাতের কোনো প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে পেশ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। সুতরাং কেউ যদি কোনো বস্তুকে আল্লাহর মত সম্মানিত ভেবে তার সামনে রুকু করে অথবা সেজদা করে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের দরজা বন্ধ করার জন্য পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় কারো সামনে মাথা নত করতে নিষেধ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো ব্যক্তি কি মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতে মাথা নত করবে? উত্তরে তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন। সালাম দেওয়ার সময় অজ্ঞ লোকেরা যদি আপনার সামনে মাথা নত করে, তবে আপনার উপর আবশ্যক হলো, তাদের কাছে বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া এবং তাকে নিষেধ করে দেওয়া।

(২) কোনো প্রয়োজনে কারো নিকট কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা। এটি সকল ক্ষেত্রে শির্ক নয়।

প্রথমত: যার কাছে দো‘আ করা হবে, সে যদি জীবিত হয়ে থাকে এবং প্রার্থিত বস্তু প্রদান করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে শির্ক হবে না। যেমন আপনি কাউকে বললেন, আমাকে পানি পান করান, আমাকে দশটি টাকা দিন, ইত্যাদি। এ ধরণের কথা শির্ক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদেরকে যখন কেউ আহ্বান করে, তবে তোমরা তার আহ্বানে সাড়া দাও”।[105]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَـٰمَىٰ وَٱلۡمَسَـٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ﴾ [النساء: ٨]

“সম্পদ বন্টনের সময় আত্মীয়, ইয়াতীম এবং মিসকীন উপস্থিত হলে, তাদেরকে তা থেকে রিযিক হিসেবে কিছু দান কর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮]

সুতরাং ফকীর যদি হাত বাড়ায় এবং বলে আমাকে কিছু দান করুন, তাহলে তা জায়েয হবে। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা তাদেরকে রিযিক রিযিক হিসেবে কিছু দাও।”

দ্বিতীয়ত: যার কাছে দো‘আ করা হলো, সে যদি মৃত হয়, তাহলে শির্ক হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিকে পরিণত হবে।

বড়ই আফসোসের বিষয় যে, কিছু কিছু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কবরে দাফনকৃত মাটির

---

[105] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ।

সাথে মিশে যাওয়া মৃত লোকটি উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে অথবা সন্তানহীনকে সন্তান দিতে সক্ষম। এটি বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ধরণের শির্ককে সমর্থন করা মদ্য পান, ব্যভিচার এবং অন্যান্য পাপ কাজ সমর্থন করার চেয়েও জঘণ্য। আল্লাহর কাছে দো'আ করি তিনি যেন মুসলিমদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।

আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কী?

প্রশ্ন: (৭২) কাউকে আল্লাহর ওলী ভেবে তার কাছে বিপদে উদ্ধার কামনা করার জন্য ফরিয়াদ করা কী? আল্লাহর ওলী হওয়ার সঠিক আলামত কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা ওলী হওয়ার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۝٦٣﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

"মনে রেখো যে, আল্লাহর ওলীদের না কোনো আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলে।" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩]

ঈমান এবং তাকওয়া আল্লাহর ওলী হওয়ার প্রধান আলামত। সুতরাং যে মুমিন হবে এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে, সেই আল্লাহর ওলী বা বন্ধু। যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, তারা আল্লাহর বন্ধু নয়; বরং তারা আল্লাহর শত্রু। আলাহ বলেন,

﴿مَن كَانَ عَدُوّٗا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوّٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ ۝٩٨﴾ [البقرة: ٩٨]

“যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, তাঁর ফিরিশতাগণের, জিবরীলের এবং মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চয় আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৯৮]

সুতরাং যে কোনো মুসলিম গাইরুল্লাহর কাছে দো'আ করবে অথবা গাইরুল্লাহর কাছে এমন বিষয়ে ফরিয়াদ করবে, যে বিষয়ে তার কোনো ক্ষমতা নেই, সে কাফির-মুশরিকে পরিণত হবে। সে কখনই আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যদিও সে তা দাবী করে থাকে। বরং তাওহীদ, ঈমান এবং তাকওয়া বিহীন তার এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তারা যেন ভণ্ড ওলীদের মাধ্যমে প্রতারিত না হয় এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব এবং সহীহ হাদীসের দ্বারস্থ হয়। তবেই তাদের আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর ওপরই হবে এবং মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। এতে ভণ্ডদের হাত থেকে তাদের ধন-সম্পদও হিফাযতে থাকবে। তেমনিভাবে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতকে আকঁড়ে ধরার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে ধোকার পথ হতে দূরে রাখার ব্যবস্থা। যারা কখনো নিজেদেরকে সায়্যেদ আবার কখনো ওলী হিসেবে দাবী করে, আপনি যদি তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, তারা আল্লাহর ওলী বা সায়্যেদ হওয়ার গুণাগুণ হতে সম্পূর্ণ দূরে। প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহর ওলী হবেন, তিনি নিজেকে ওলী হিসাবে প্রকাশ করা থেকে দূরে থাকবেন। আপনি তাকে পরহেজগার মুমিন হিসেবে দেখতে পাবেন। তিনি প্রকাশ করবেন না। তিনি মানুষের মাঝে ওলী

হিসাবে প্রকাশিত হন বা মানুষ তার দিকে ধাবিত হোক, কোনোটাই পছন্দ করবেন না। কোনো মানুষ যদি এতটুকু কামনা করে যে, লোকেরা তাকে সম্মান করুক, তার কাছে এসে ভীড় করুক, তাহলে এটা হবে তাকওয়া এবং ওলী হওয়ার পরিপন্থী। যে ব্যক্তি মূর্খদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের সাথে বিতর্ক করা কিংবা লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অর্জন করবে, তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কঠিন সতর্ক বাণী এসেছে। যারা নিজেদেরকে ওলী হিসাবে দাবী করে এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তারা প্রকৃত ওলীর গুণাগুণ হতে অনেক দূরে।

মুসলিম ভাইদের প্রতি আমার নসীহত হলো, তারা যেন এ সমস্ত ভন্ডদের থেকে সাবধান থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর দিকে ফিরে এসে আল্লাহকেই একমাত্র আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: (৭৩) জাদু কাকে বলে? জাদু শিক্ষার হুকুম কী?

উত্তর: আলিমগণ বলেন, জাদু বলা হয় প্রত্যেক এমন ক্রিয়া-কলাপকে, যার কারণ অস্পষ্ট ও গোপন থাকে, কিন্তু বাইরে তার প্রভাব দেখা যায়। গণক এবং জ্যোতিষের কার্যকলাপও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। চাকচিক্যময় বক্তব্য ও ভাষার প্রভাবকেও জাদু বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»

“নিশ্চয় কিছু কিছু বক্তৃতার মধ্যে জাদু রয়েছে।”[106]

সুতরাং প্রতিটি বস্তুর গোপন প্রভাবকে জাদু বলা হয়। আর পরিভাষায় এমন কিছু গিরা এবং ঝাড়ফুঁকের নাম, যা মানুষের অন্তর, মস্তিস্ক এবং শরীরের ভিতরে প্রভাব বিস্তার করতঃ কখনো জ্ঞান শুণ্য করে ফেলে, কখনো ভালোবাসা বা ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। , বরং তা কখনো কুফুরী এবং শির্কের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَٰنَۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحۡرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلۡمَلَكَيۡنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَٰقٖۚ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো, তারা তারই অনুসরণ করছে এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হন নি; কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করছিল, তারা লোকদেরকে জাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিতো এবং উভয়ে কাউকে ওটা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নই। অতএব, তোমরা কুফুরী করো না, অনন্তর

---

[106] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: বিবাহ।

যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোনো উপকার সাধিত না হয়। নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে যে, যে কেউ ওটা ক্রয় করবে, তার জন্যে পরকালে কোনো অংশ নেই।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

সুতরাং শয়তানকে শরীক বানানোর মাধ্যমে এ ধরণের জাদু শিক্ষা এবং ব্যবহার করা কুফুরী এবং সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যেই জাদুকরের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে তাকে কাফির এবং মুরতাদ হিসেবে হত্যা করতে হবে। আর তার জাদু যদি কুফুরী পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে মুসলিমদেরকে তার ক্ষতি হতে হিফাযত করার জন্য তাকে দণ্ড প্রয়োগ করে করে হত্যা করতে হবে।

প্রশ্ন: (৭৪) জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মিশের ব্যবস্থা করার হুকুম কী?

উত্তর: জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা তৈরি করা হারাম। অনুরূপভাবে জাদুর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করাও হারাম। কখনো কখনো শির্কে পরিণত হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَزَوۡجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ

خَلَٰقٍۚ﴾ [البقرة: ١٠٢]

“এবং উভয়ে কাউকেও ওটা শিক্ষা দিতো না, এমনকি তারা বলতো যে, আমরা পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়, অতএব, তোমরা কুফুরী করো না, অনন্তর যাতে স্বামী ও তদীয় স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তারা উভয়ের নিকট তাই শিক্ষা করতো এবং তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতো না এবং তারা ওটাই শিক্ষা করত, যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোনো উপকার সাধিত না হয়, এবং নিশ্চয় তারা জ্ঞাত আছে আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে তার জন্যে পরকালে কোনো অংশ নেই। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২]

প্রশ্ন: (৭৫) গণক কাকে বলে? গণকের কাছে যাওয়ার বিধান কী?

উত্তর: গণক এমন লোককে বলা হয়, যে অনুমানের ওপর নির্ভর করে ভিত্তিহীন বিষয়ের অনুসন্ধান করে থাকে। জাহেলী যামানার কিছু পেশাদার লোকের সাথে শয়তানের যোগাযোগ ছিল। শয়তানেরা চুরি করে আকাশের সংবাদ শ্রবণ করত এবং তাদের কাছে বলে দিত। আকাশ থেকে যা শ্রবণ করত, তার সাথে আরো অনেক মিথ্যা কথা সংযোগ করে মানুষের মধ্যে তা প্রকাশ করত। তারা যা বলত, তার একটি কথা সত্য হলে মানুষ ধোকায় পড়ে যেত এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য ও ভবিষ্যতে কি হবে, তা জানতে গণকদের কাছে আসা শুরু করত। এ জন্যই আমরা বলি যে, গণক হচ্ছে সেই লোক, যে

ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে। যারা গণকের কাছে আসে, তারা তিনভাগে বিভক্ত:

(১) গণকের কাছে এসে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস না করা। এটা হারাম। এ ধরণের লোক সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবূল হবে না।”[107]

(২) গণকের কাছে এসে তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার কথায় বিশ্বাস করা। এটা আল্লাহর সাথে কুফুরী করার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে ইলমে গায়েবের দাবীতে গণককে বিশ্বাস করেছে। মানুষ ইলমে গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করলে আল্লাহর কথাকে অবিশ্বাস করা হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: ٦٥]

“বলুন, আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ ছাড়া গায়েবের সংবাদ অন্য কেউ জানে না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[107] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুস সালাম।

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

“যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট গমন করে তার কথায় বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ বিষয় (কুরআন ও সুন্নাহ)-এর সাথে কুফুরী করল।”[108] এ ধরণের মানুষ তাওবা না করে মারা গেলে কুফুরী অবস্থায় তার মৃত্যু হবে।

(৩) গণককে পরীক্ষার জন্য এবং মানুষের সামনে তার ধোঁকাবাজির কথা তুলে ধরার জন্য তার কাছে যেতে কোনো অসুবিধা নেই। ইবন সায়্যাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমণ করলে তিনি মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে ইবন সায়্যাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল তো আমি কি গোপন করেছি? ইবন সায়্যেদ বলল, আদ-দুখ অর্থাৎ আদ-দুখান (ধোঁয়া)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অকল্যাণ হোক তোমার! তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।

প্রশ্ন: (৭৬) রিয়া বা মানুষকে দেখানো ও শুনানোর নিয়তে ইবাদাত করার বিধান কী?

উত্তর: যে ইবাদাত ‘রিয়া’ মিশ্রিত হয় তা তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: ইবাদাত মূলতঃ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই করা হয়। যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ‘সালাত’ আদায় করা। ইহা শির্ক এবং এ প্রকার ইবাদাত বাতিল।

---

[108] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাহ।

দ্বিতীয় প্রকার: ইবাদাত করার মধ্যবর্তী অবস্থায় 'রিয়ায়' পতিত হওয়া। অর্থাৎ যেমন ইবাদাত শুরুর সময় একনিষ্ঠভাবে আরম্ভ করে কিন্তু ইবাদাতের মধ্যবর্তী সময়ে 'রিয়া' সৃষ্টি হয়। এ ধরণের ইবাদত দু'অবস্থা হতে খালি নয়:

প্রথম অবস্থা: যদি উক্ত ইবাদতের প্রথমাংশ শেষাংশের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে তাহলে প্রথমাংশ শুদ্ধ হবে এবং দ্বিতীয় অংশ বাতিল হবে। এর উদাহরণ হলো: যেমন, কোনো ব্যক্তি একশত টাকা দান করার ইচ্ছা পোষণ করল। এর মধ্যে ৫০টাকা দান করল খালেস নিয়তে। বাকী ৫০টাকা দান করল লোক দেখানোর নিয়তে। পরের ৫০টাকা দান করার সময় রিয়া মিশ্রিত হওয়ার কারণে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা: যদি ইবাদাতটির শেষাংশ প্রথমাংশের ওপর ভিত্তিশীল হয় তবে এর দু'টি অবস্থা:

(ক) ইবাদাতকারী ব্যক্তি 'রিয়া'-কে প্রতিহত করবে এবং 'রিয়া'-এর ওপর সিহর হবে না। এমতাবস্থায় 'রিয়া' ইবাদাতে কোনো প্রকার প্রভাব ফেলবে না অথবা কোনো ক্ষতিও করবে না। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতের মনে যে সমস্ত কথা উদিত হয় সেগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি তা কাজে পরিণত না করে বা মুখে তা উচ্চারণ না করে"।[109]

[109] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত তালাক।

(খ) অপর অবস্থাটি হলো: ইবাদাতকারী ‘রিয়া’-এর প্রতি তুষ্ট থাকবে এবং ‘রিয়া’-কে অন্তরে প্রতিহত করবে না। এমতাবস্থাহায় তার পূর্ণ ইবাদাতটি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইবাদাতের শেষাংশ প্রথমাংশের ওপর ভিত্তিশীল। যেমন, কোনো ব্যক্তি ‘সালাতে’ দাড়াল ইখলাসের সাথে, অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে তার অন্তরে ‘রিয়া’-এর উদয় হলো এবং উক্ত ব্যক্তি ‘রিয়া’-এর প্রতি তুষ্ট থাকল (অন্তরে ‘রিয়া’-কে প্রতিহত করল না) এমতাবস্থায় পূর্ণ ‘সালাত’ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সালাতের শেষাংশের সাথে প্রথমাংশ সম্পৃক্ত রয়েছে।

তৃতীয় প্রকার: ইবাদাত সমাপ্ত করার পর যদি ইবাদাতকারীর অন্তরে ‘রিয়া’-এর উদ্ভব ঘটে, তবে তা ইবাদাতে কোনো প্রকার প্রভাব ফেলবে না বা ইবাদতটি বাতিলও হবে না। কারণ, বিশুদ্ধভাবে তা সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদিত হওয়ার পর রিয়ার কারণে তা নষ্ট হবেনা।

ইবাদাত দেখে কেউ প্রশংসা করলে এবং তাতে ইবাদাতকারী খুশী হলে তা রিয়ার অন্তর্গত হবে না। কারণ, এটি ইবাদাত সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকাশিত হয়েছে। আনুগত্যের কাজ করার পর মানুষ খুশী হবে, এটাই স্বাভাবিক; বরং এটি তার ঈমানের প্রমাণ বহন করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ»

“নেকীর কাজ করে যে খুশী হয় এবং পাপের কাজকে যে খারাপ মনে করে, সেই প্রকৃত মুমিন।”[110]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»

“ইহা মুমিনদের আগাম শুভ সংবাদ”।[111]

প্রশ্ন: (৭৭) কুরআন নিয়ে শপথ করার হুকুম কী?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তর একটু বিস্তারিতভাবে দেওয়া প্রয়োজন। যখন একজন ব্যক্তি কোনো বস্তুর নামে শপথ করে, তখন উক্ত বস্তুকে সম্মানিত মনে করেই করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ বা তাঁর অন্য কোনো নাম অথবা কোনো সিফাত (গুণাবলী) ব্যতীত অন্য বস্তুর নামে শপথ করা জায়েয নেই। যেমন, কেউ বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এ কাজটি অবশ্যই করব অথবা বলল কাবা ঘরের প্রভুর শপথ! আল্লাহর বড়ত্বের শপথ! ইত্যাদি।

কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম (কথা)। আল্লাহর কথা তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কথা বলা আল্লাহর সত্বাগত সিফাত। তিনি সদাসর্বদা এ গুণে গুণান্বিত। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন। কথা বলার শক্তি থাকা বা বাকশক্তি থাকা একটি পূর্ণতার গুণ। আল্লাহ তা‘আলা সকল দিক

---

[110] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান।

[111] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: কিতাবুয জুহদ।

থেকে পরিপূর্ণ। তাই কথা বলা আল্লাহর একটি সত্বাগত গুণ। যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি কথা বলেন, এ দৃষ্টি কোনো থেকে কথা বলা একটি কর্মগত গুণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [يس: ٨٢]

“তাঁর ব্যাপার শুধু এ যে, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন ওকে বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।” [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২] এখানে কথা বলাকে ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যখন ইচ্ছা কথা বলেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক দলীল রয়েছে। যারা বলে আল্লাহ সদাসর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত, কিন্তু আল্লাহর কথা তাঁর সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত, বাইরে এর কোনো প্রভাব নেই বা কেউ তাঁর কথা শ্রবণ করতে পারে না, তাদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া তাদের মাযহাব বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ৯০টি যুক্তি বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু কুরআন মাজীদে আল্লাহর কালাম রয়েছে, আর আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই কুরআনের শপথ করা জায়েয আছে। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এটাকে বৈধ বলেছেন। শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয় এমন শব্দ উচ্চারণ করে শপথ করা ঠিক নয়। সাধারণ লোকেরা যাতে বুঝতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা শপথ করা উচিৎ। কেননা মানুষ বুঝতে পারে এবং তাদের অন্তরে স্বস্তি অর্জিত হয়, এমন বক্তব্য মানুষের কাছে পেশ করাই উত্তম। শপথ যেহেতু আল্লাহ, তাঁর নাম এবং সিফাতের মাধ্যমেই করতে হবে, তাই গাইরুল্লাহ, নবী, জিবরীল ফিরিশতা, কা‘বা বা অন্য কোনো মাখলুকের নামে শপথ করা জায়েয

নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»

“যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা যেন চুপ থাকে।”[112]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফুরী বা শির্ক করল।”[113]

কেউ যদি কোনো মানুষকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর হায়াত কিংবা অন্য ব্যক্তির নামে শপথ করতে দেখে, তা হলে সে যেন তাকে নিষেধ করে এবং বলে দেয় যে, এটা হারাম। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আদেশ বা নিষেধ যাতে নম্র ভাষায় হয়। যাতে করে সে সহজেই নসীহত কবূল করতে পারে। কেননা অনেক মানুষ রয়েছে, যারা রাগান্বিত হয়ে মানুষকে আদেশ-নিষেধ করে থাকে। অনেক সময় তাদের চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। মনে হয় সে যেন নিজের প্রতিশোধ নিচ্ছে। এতে করে শয়তান সুযোগ পেয়ে যায়। মানুষ যদি পরস্পরকে সম্মান করতো, হিকমত এবং নম্রতার সাথে তাকে দীনের দিকে দাওয়াত দিতো, তা হলে তাদের কথা অধিক গ্রহণযোগ্য হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[112] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুশ শাহাদাত।

[113] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর।

«إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ»

“নিশ্চয় আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার মাধ্যমে তা দান করেন না।”[114]

একদা জনৈক গ্রাম্যলোক মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করে দিল। লোকেরা তাকে ধমকাতে শুরু করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ধমকাতে নিষেধ করলেন। লোকটি যখন পেশাব শেষ করল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাছে ডেকে এনে বললেন, এ সকল মসজিদ আল্লাহর ঘর, পেশাব বা ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান নয়। তা কেবল আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করা, তাসবীহ পাঠ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্যই নির্দিষ্ট। অতঃপর তিনি সাহাবীগণকে পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। এতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এবং মসজিদ পবিত্র হয়ে গেল। সাথে সাথেগ্রাম্য লোকটিকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যও সফল হয়ে গেল। আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকেও এরূপ হওয়া উচিৎ। আমরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য পন্থায় সত্যকে তুলে ধরব। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

[114] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল বির্ ওয়াস সিলাহ

গাইরুল্লাহর নামে শপথ করার বিধান কী?

প্রশ্ন: (৭৮) নবীর নামে, কাবার নামে এবং মান-মর্যাদা ও জিম্মাদারীর নামে শপথ করার বিধান কী?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে শপথ করা জায়েয নয়, বরং ইহা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে কাবার নামে শপথ করা শির্ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কাবা উভয়টিই মাখলুক। আর কোনো মাখলুকের নামে শপথ করাই শির্ক। এমনিভাবে সম্মান এবং জিম্মাদারীর শপথ করাও শির্ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফুরী বা শির্ক করল।”[115]

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ»

---

[115] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল আইমান ওয়ান্ নুযুর (শপথ ও মানত)।

“তিনি তাঁর পিতা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে পিতার নামে শপথ করতে শুনলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার লোকজনকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতার নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।”[116] কিন্তু “আমার জিম্মায়” একথাটি শপথ নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অঙ্গিকার।

প্রশ্ন: (৭৯) যে ব্যক্তি কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, কবরবাসীর কাছে দো‘আ করে এবং তাদের জন্য নযর-মানত পেশসহ অন্যান্য ইবাদাত করে থাকে, তার হুকুম কী?

উত্তর: এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। বিস্তারিতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। তাই আমরা বলব যে, কবরবাসীগণ দু’প্রকার:

(১) যারা ইসলামের ওপর মারা গেছে এবং মানুষ তাদের প্রশংসা করে থাকে, আশা করা যায় এদের পরিণতি ভালো হবে; কিন্তু তারা মুসলিম ভাইয়ের দো‘আর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে আগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের

---

[116] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল আদব।

অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

মৃত ব্যক্তি নিজের অকল্যাণ দূর করতে বা কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম নয়। কীভাবে সে অপরের কল্যাণ করতে পারবে অথবা অপরের পক্ষ হতে অকল্যাণ দূর করতে পারবে?

(২) যারা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় শির্কের মতো পাপ নিয়ে মারা গেছে তারা দাবী করতো যে, তারা আল্লাহর ওলী, তারা গায়েবের খবর রাখে। এমনকি রুগীর আরোগ্য দান, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের দাবীও করে থাকে। এরা কুফুরী অবস্থায় মারা গেছে। এদের জন্য দো'আ করা এবং আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রহমত কামনা করা জায়েয নেই।

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ ١١٣ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ ١١٤﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤]

"নবী ও মুমিনদের উচিৎ নয় মুশরিকদের জন্য মাগফেরাত কামনা করা। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হোক- একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নমী। আর ইবরাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু,

তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৩-১১৪]

কবরবাসীগণ কারো ক্ষতি বা কল্যাণ করতে পারে না। তাই কবরবাসীদের কাছে এগুলো কামনা করা জায়েয নেই। যদিও কোনো কোনো কবর থেকে কারামাত প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন কবর থেকে আলো বের হওয়া, সুঘ্রাণ বের হওয়া ইত্যাদি। অথচ তারা শির্কের ওপরে মারা গেছে। তাদের কবর থেকে যদি এরূপ কিছু বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটি ইবলীস শয়তানের ধোঁকা মাত্র।

মুসলিমদের উচিৎ শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর সকল প্রকার আশা-ভরসা করা। কেননা তাঁর হাতেই আকাশ-জমিনের একমাত্র রাজত্ব। তাঁর দিকেই সকলে প্রত্যাবর্তন করবে। তিনিই ফরিয়াদকারীর দো'আ কবূল করেন এবং মানুষের অকল্যাণ দূর করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ ٥٣﴾ [النحل: ٥٣]

"তোমাদের কাছে যে সমস্ত নি'আমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর।" [সূরা আর-নাহল, আয়াত: ৫৩]

মুসলিমদের জন্য আমার আরো নসীহত এ যে, তারা যেন দীনী বিষয়ে কারো তাকলীদ[117] না করে এবং একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিঃশর্ত অনুসরণ করে। আল্লাহ বলেন,

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ﴾ [الاحزاب: ٢١]

“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [ال عمران: ٣١]

“বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

মুসলিমদের আবশ্যক হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা যেন তার আমলগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখে। তার আমলগুলো যদি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত

---

[117] বিনা দলীলে কারো কথাকে মেনে নিয়ে অন্ধভাবে তার অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলে। -অনুবাদক।

মোতাবেক হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, সে আল্লাহর ওলী। আর যদি তার ভিতরে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল পাওয়া যায়, তাহলে কোনো ক্রমেই সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে ওলী হওয়ার মানদণ্ড বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۝٦٣﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

“জেনে রেখো, যারা আল্লাহর ওলী, তাদের না আছে কোনো ভয়-ভীতি, না তারা চিন্তিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং তারা ভয় করে চলে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩]

সুতরাং যে মুমিন-মুত্তাকী, সেই আল্লাহর ওলী। আর যে ব্যক্তির ভিতরে ঈমান এবং তাকওয়া নেই, সে আল্লাহর ওলী হতে পারে না। যার ভিতরে যতটুকু ঈমান ও আমল রয়েছে, তার ভিতরে ততটুকু আল্লাহর বন্ধুত্ব রয়েছে। তবে আমরা নির্দিষ্ট করে কাউকে আল্লাহর ওলী হিসাবে সার্টিফিকেট দিতে পারি না। আমরা বলতে পারি, যিনি মুমিন-মুত্তাকী হবেন তিনি আল্লাহর ওলী হবেন।

কবরের ভক্তরা কবরবাসীর কাছে দো'আ করলে অথবা কবর থেকে মাটি নিলে যদিও কখনো কখনো তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তথাপিও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, কবরবাসীই উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের কারণ। এটি কবরবাসীর কাছে দো'আকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিতনার কারণও হতে পারে। কারণ, আমরা জানি যে, কবরবাসী কারও দো'আ

কবূল করার ক্ষমতা রাখেন না কিংবা কবরের মাটি কল্যাণ আনয়ন করতে বা ক্ষতি দমন করতে সক্ষম নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ۝٥ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَٰفِرِينَ ۝٦﴾ [الاحقاف: ٥، ٦]

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুকে আহ্বান করে, যে কেয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? তারা তো তাদের আহ্বান সম্পর্কেও বেখবর। যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫-৬]

আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝٢٠ أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝٢١﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]

“এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে ওরা তো কোনো বস্তুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃজিত। তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে তারা পুনরুত্থিত হবে, তাও জানে না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২০-২১]

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ছাড়া যাকেই ডাকা হোক না কেন, ডাকে সাড়া দিবে না এবং আহ্বানকারীর কোনো উপকারও করতে পারবে না।

তবে কখনও কখনও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দো‘আ করার সময় প্রার্থিত বস্তু অর্জিত হয়ে হয়ে থাকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে ইহা একটি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে পাপ কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। যাতে তিনি জানতে পারেন কে আল্লাহর খাঁটি বান্দা আর কে প্রবৃত্তির অনুসারী।

আপনি জানেন না যে শনিবারের দিন আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের ওপর মাছ শিকার করা হারাম করেছিলেন? ঐ দিকে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য শনিবারের দিন প্রচুর পরিমাণ মাছ সাগরের কিনারায় পাঠিয়ে দিলেন। শনিবার ছাড়া অন্য দিনে মাছগুলো লুকিয়ে থাকত। এভাবে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হলো। য়াহূদীরা বলল, কীভাবে আমরা এ মাছগুলো থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখব? অতঃপর তারা চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা জাল তৈরি করে শনিবার দিন তা সাগরে ফেলে রাখবে আর রবিবারের দিন মাছ শিকার করব। আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার জন্য তারা কৌশল অবলম্বন করল। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে বানরে পরিণত করে দিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَسۡـَٔلۡهُمۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ إِذۡ يَعۡدُونَ فِي ٱلسَّبۡتِ إِذۡ تَأۡتِيهِمۡ حِيتَانُهُمۡ يَوۡمَ سَبۡتِهِمۡ شُرَّعٗا وَيَوۡمَ لَا يَسۡبِتُونَ لَا تَأۡتِيهِمۡۚ كَذَٰلِكَ نَبۡلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ١٦٣﴾ [الاعراف: ١٦٣]

“আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন যা ছিল সাগরের তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে

সীমাক্রিম করতে লাগল। যখন শনিবারের দিন মাছগুলো আসতে লাগল তাদের কাছে দলে দলে। আর যে দিন শনিবার হত না, সে দিন আসত না। এভাবে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৩]

লক্ষ করুন! যেদিন তাদের জন্য মাছ ধরা নিষেধ ছিল সেদিন কীভাবে আল্লাহ তাদের জন্য মাছগুলো তাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছিল? কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। তাই আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার জন্য তারা কৌশল অবলম্বন করল।

আরো লক্ষ করুন! নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের প্রতি, তারা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের নিকট এমন কিছু শিকারযোগ্য প্রাণী পাঠিয়ে পরীক্ষা করলেন যা ছিল তাদের জন্য হারাম। প্রাণীগুলো তাদের হাতের নাগালে ছিল; কিন্তু সাহাবীগণ কোনো জন্তু শিকার করেন নি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٩٤﴾ [المائدة: ٩٤]

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে- যাতে আল্লাহ বুঝতে পারেন যে, কে তাঁকে অদৃশ্যভাবে

ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপরও সীমা অতিক্রম করবে তার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৯৪]

সুতরাং শিকারগুলো ছিল তাদের হাতের নাগালে। মাটিতে চলাচলকারী প্রাণীগুলো হাতেই ধরা যেত। উড়ন্ত পাখিগুলো বর্শা দিয়েই শিকার করা যেত। শিকার ধরা ছিল অত্যন্ত সহজ। কিন্তু সাহাবীগণ আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং কোনো প্রাণীই শিকার করেন নি।

এমনিভাবে কোনো মানুষের জন্য যখন হারাম কাজ করা সহজ হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে ভয় করে উক্ত হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং এটা মনে রাখবে যে, কারো জন্য হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার পথ সহজ করে দেওয়া তার জন্য একটি পরীক্ষা স্বরূপ। কাজেই ধৈর্য ধারণ করা উচিৎ। পরহেজগারদের জন্যই উত্তম পরিণতি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মসজিদের ভিতরে হওয়ার জবাব

প্রশ্ন: (৮০) যে সমস্ত কবর পূজারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মসজিদের ভিতরে হওয়াকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কীভাবে তাদের উত্তর দিব?

উত্তর: উক্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা কয়েকভাবে দিতে পারি:

১) মসজিদটি মূলতঃ কবরের উপর নির্মাণ করা হয় নি; বরং এ মসজিদ নির্মিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়।

২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে দাফন করা হয় নি। কাজেই একথা বলার অবকাশ নেই যে ইহাও সৎ ব্যক্তিদেরকে মসজিদে দাফন করার কুপ্রথার অন্তর্ভুক্ত; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর নিজ ঘরে দাফন করা হয়েছে।

৩) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরগুলোকে মসজিদে প্রবেশ করানো সাহাবীগণের যৌথ সিদ্ধান্তে হয় নি; বরং তাদের অধিকাংশের মৃত্যুর পর হয়েছে। তখন তাদের অল্প কয়েকজন মাত্র বেঁচে ছিলেন। উহা ঘটেছিল ৯৪ হি. সনে মসজিদ সম্প্রসারণ কালে। এ কাজটি সাহাবীগণের অনুমতি বা তাদের যৌথ সিদ্ধান্তে হয় নি। সাঈ‘দ ইবন মুসাইয়্যেব তাদের মধ্যে অন্যতম।

৪) কবরটি মূলতঃ মসজিদের ভিতরে নয়। কারণ, উহা মসজিদ হতে সম্পূর্ণ পৃথক কক্ষে রয়েছে। আর মসজিদকে এর উপর বানানো হয় নি। এ স্থানটিকে তিনটি প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত ও বেষ্টিত করা হয়েছে। আর উত্তর দিকের প্রাচীরটি ত্রিভুজের মত করে রাখা হয়েছে। এতে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরটি সরাসরি মুসল্লীর সামনে পড়ে না। আশা করি কবর পূজারীদের দলীল খণ্ডনে উপরোক্ত উত্তরগুলোই যথেষ্ট হবে।

প্রশ্ন: (৮১) কবরের উপর নির্মাণ কাজ করা কী?

উত্তর: কবরের উপর নির্মাণ কাজ করা হারাম। যেমন, কবর পাকা করা, কবরের চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করা, গম্বুজ ইত্যাদি তৈরি করা ইত্যাদি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে কবরবাসীকে অতিরিক্ত সম্মান করার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কবরবাসীদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করারও ভয় রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ কবরের অবস্থাই তাই। অধিকাংশ মানুষই কবরবাসীদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে। আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার আশায় কবরবাসীর উসীলায় দো'আ করে থাকে। কবরবাসীদের কাছে দো'আ করা এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য তাদের কাছে ফরিয়াদ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

প্রশ্ন: (৮২) মসজিদে দাফন করার বিধান কী?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দাফন করতে এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তেও কবরকে মসজিদে পরিণতকারীদের ওপর লা'নত করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, কবরকে মসজিদে পরিণত করা ইয়াহূদী-খৃষ্টানাদের কাজ।[118] কারণ, মসজিদে দাফন করা এবং কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা শির্কের মাধ্যম ও বাহন। মসজিদে মৃত ব্যক্তিদেরকে দাফন করা হলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে, দাফনকৃত ব্যক্তি কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে অথবা তার এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তার আনুগত্যকে আবশ্যক করে। মুসলিমদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে এ ভয়াবহ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। মসজিদগুলো যেন সকল প্রকার শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে সহীহ আকীদা এবং নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয় সে চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨﴾ [الجن: ١٨]

“এবং মসজিদসমূহ আল্লাহ তা‘আলার জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

সুতরাং মসজিদসমূহ সকল প্রকার শির্কের চিহ্ন থেকে মুক্ত করতে হবে। তাতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, যাঁর কোনো শরীক নেই। এটাই মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব।

[118] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল জানায়েয।

প্রশ্ন: (৮৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করার হুকুম কী?

উত্তর: যে কোনো কবর যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

"তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের দিকে ভ্রমণ করো না। মসজিদুল হারাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা"।[119]

হাদীসের উদ্দেশ্য হলো ইবাদাতের নিয়তে পৃথিবীর কোনো স্থানের দিকে সফর করা যাবে না। কারণ, এ তিনটি মসজিদের দিকেই ইবাদাতের নিয়তে সফর করা জায়েয। অন্য কোনো মসজিদের দিকে ভ্রমণ করা জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের উদ্দেশ্যে নয়, বরং তাঁর মসজিদে ইবাদাতের নিয়তে সফর করতে হবে। মসজিদে পৌঁছে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করা

---

[119] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবু ফাযলিস সালাতি ফী মাসজিদে মক্কা ওয়াল মদীনা।

সুন্নাত। তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই।

কবরের মাধ্যমে বরকত কামনা এবং তার চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা হারাম।

প্রশ্ন: (৮৪) কবরের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা বা উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কিংবা নৈকট্য হাসিলের জন্য কবরের চার পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করার হুকুম কী?

উত্তর: কবর থেকে বরকত কামনা করা হারাম এবং উহা শির্কের পর্যায়ে। কেননা এটা এমন এক বিশ্বাস, যার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। সালাফে সালেহীন থেকে কবরের বরকত গ্রহণ করার কথা প্রমাণিত নয়। এ দৃষ্টিকোন থেকে এটি বিদ'আতও বটে। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, কবরবাসী অকল্যাণ প্রতিহত করা এবং কল্যাণ আনয়নের ক্ষমতা রাখে, তাহলে এটি বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে রুকু, সাজদাহ, নৈকট্য লাভ বা সম্মানের নিয়তে যদি কবরবাসীর জন্য কুরবানী করে তাও শির্কে পরিণত হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ١١٧﴾ [المؤمنون: ١١٧]

"যে কেউ বিনা দলীলে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকে, তার হিসাব তার রবর কাছে। নিশ্চয় কাফেরেরা সফলকাম হবে না।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১১৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾ [الكهف: ١١٠]

"যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবর ইবাদাতে কাউকে শরীরক না করে।" [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

যে ব্যক্তি বড় শির্কে লিপ্ত হবে সে কাফির হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾ [المائدة: ٧٢]

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৭২]

আল্লাহ ছাড়া যার নামে শপথ করা হলো, তাকে যদি আল্লাহর সম পর্যায়ের সম্মানিত মনে করে, তাহলে বড় শির্কে পরিণত হবে। আর যদি শপথকারীর অন্তরে শপথকৃত বস্তুর প্রতি সম্মান থাকে, কিন্তু সেই সম্মান আল্লাহর সম্মানের পর্যায়ে মনে না করে, তাহলে ছোট শির্কে পরিণত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফুরী অথবা শির্ক করল।”১২০

যারা কবর থেকে বরকত হাসিল করে, কবরবাসীর কাছে দো‘আ করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করে, তাদের প্রতিবাদ করা ওয়াজিব। তাদের যুক্তি, “আমরা পূর্ব পুরুষদেরকে এ অবস্থায় পেয়েছি”। একথা আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। যে সমস্ত কাফির নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরও যুক্তি এটিই ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ ٢٣﴾ [الزخرف: ٢٣]

“এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এ পথের পথিক পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩]

তাদের কাছে প্রেরিত রাসূল বললেন,

﴿أَوَلَوۡ جِئۡتُكُم بِأَهۡدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمۡ عَلَيۡهِ ءَابَآءَكُمۡۖ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾ [الزخرف: ٢٤]

[120] তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযুর।

“তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে বিষয়ের ওপর পেয়েছ, আমি যদি তদাপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٢٥﴾ [الزخرف: ٢٥]

“অতঃপর আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৫]

অতএব, দেখুন! মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হয়েছে। ভুলের ওপর থেকে কারও পক্ষে বাপ-দাদাদের অথবা দেশাচলের দোহাই দেওয়া বৈধ নয়। এসব দোহাই তাদের কোনো উপকারে আসবে না। বরং তাদের উচিৎ আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং সত্যের অনুসরণ করা। দেশাচল এবং মানুষের তিরস্কারের ভয় যেন তাদেরকে সত্যের অনুসরণের পথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। সত্যিকারের মুমিন কোনো প্রকার সমালোচনাকারীর সমালোচনার ভয় করে না এবং আল্লাহর দীন হতে কোনো কিছুই বাঁধা দিতে পারে না।

প্রশ্ন: (৮৫) প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে সালাত পড়ার বিধান কী?

উত্তর: প্রাণী অথবা মানুষের ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ»

“যে ঘরে ছবি রয়েছে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।”[121] স্মৃতি স্বরূপ কারও ছবি যত্ন করে রেখে দেওয়াও জায়েয নেই। কাজেই যার কাছে এ রকম ছবি রয়েছে, তার উচিৎ এগুলো নষ্ট করে দেওয়া। দেওয়ালে ঝুলন্ত থাকুক কিংবা এ্যালবামের ভিতরে সংরক্ষিত থাকুক অথবা অন্য কোনো স্থানে থাকুক। কারণ, ঘরের মধ্যে ছবি থাকলে ঘরের মালিক রহমতের ফিরিশতাদের প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন: (৮৬) ঘরের দেওয়ালে ছবি ঝুলানোর বিধান কী?

উত্তর: ঘরের দেওয়ালে ছবি ঝুলিয়ে রাখা সম্পূর্ণ হারাম। বিশেষ করে বড় ছবিগুলো। রকম করে থাকে। এ ধরণের সম্মান থেকেই শির্কের সূচনা হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নূহ আলাইহিস সালামএর কাওমের লোকেরা প্রথমে কতিপয় সৎ লোকের ছবি উঠিয়ে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দেখে তাদের ইবাদাতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ইবাদাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা স্বয়ং উক্ত সৎ ব্যক্তিদের ইবাদাত শুরু করে দেয়।

প্রশ্ন: (৮৭) ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি উঠানোর বিধান কী?

---

[121] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল লিবাস।

উত্তর: ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এ জন্য হাতে কোনো প্রকার কাজ করতে হয় না। এই যে, ছবি তোলার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য যদি হয় ছবিকে সম্মান করা, তা হলে হারাম হবে। কারণ, নিষিদ্ধ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যম ও উপকরণ ব্যবহার করাও হারাম। তাই স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ছবি সংগ্রহ করা নিষেধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»

“যে ঘরে ছবি রয়েছে, সেই ঘরে আল্লাহর রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।”[122]

এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ঘরে ছবি রাখা অথবা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা জায়েয নয়।

---

[122] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল লিবাস।

ইসলামে বিদ‘আতের কোনো স্থান নেই।

প্রশ্ন: (৮৮) (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) **‘যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোনো সুন্নাত চালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছ’ -এ হাদীসকে যে সমস্ত বিদ‘আতী তাদের বিদ‘আতের পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা কীভাবে তাদের উত্তর দিব?**

উত্তর: তাদের জবাবে আমরা বলব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»

“যে ব্যক্তি ইসলামের ভিতরে উত্তম কোনো সুন্নাত চালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে।”

তিনি তো ইহাও বলেছেন যে,

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَاةٍ فِي النَّارِ»

“তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহর অনুরণ করবে এবং তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর তোমরা নতুন আবিস্কৃত বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কারণ, প্রতিটি

নব আবিস্কৃত বিষয়ই বিদ‘আত আর প্রতিটি বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম।”[123]

প্রশ্নে বর্ণিত যে হাদীসটিকে বিদ‘আতীরা দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে, সেই হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা এই যে, মুযার গোত্রের কিছু অভাবী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমণ করলে তিনি সদকা করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। এক ব্যক্তি থলে ভর্তি রূপা নিয়ে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাজির হল। তখন তিনি বললেন,

«مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম কোনো সুন্নাত চালু করল, তার জন্য ছাওয়াব রয়েছে এবং তার পরে কিয়ামত পর্যন্ত যারা সেই সুন্নাহর ওপর আমল করবে, তাদের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাবে।”[124]

হাদীসের প্রেক্ষাপট থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, উত্তম সুন্নাত বলতে সুন্নাহর ওপর নতুনভাবে আমল শুরু করাকে বুঝানো হয়েছে। নতুনভাবে কোনো আমল তৈরি করার কথা বলা হয় নি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো জন্য শরী‘আতের কোনো বিধান প্রবর্তন করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীসের অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তি

[123] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ।

[124] ইবন মাজাহ, অধ্যায়: আল-মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা)

যদি সুন্নাহর ওপর আমল করে, তার আমল দেখে অন্যরাও যদি সেই সুন্নাহর ওপর আমল করা শুরু করে, তাহলে প্রথম আমলকারী ব্যক্তি নিজে আমল করার ছাওয়াব পাওয়ার সাথে সাথে তাকে দেখে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, শরী'আতসম্মত কোনো ইবাদাত পালনের মাধ্যম বা উপকরণ যেমন ধর্মীয় কিতাব রচনা করা, ইলম প্রচার করা, মাদরাসা নির্মাণ করা ইত্যাদি। এমন নয় যে, নতুন ইবাদাত তৈরি করা। মানুষের ইচ্ছামত যদি শরী'আত প্রবর্তন করা জায়েয হয়, তাহলে অর্থ এই হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম পরিপূর্ণ হয় নি। কোনো বিদ'আত প্রবর্তন করে তাকে হাসানাহ বা উত্তম বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়। যেহেতু তিনি বলেন, প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী।

প্রশ্ন: (৮৯) ঈদে মীলাদুন নবী পালনের হুকুম কী?

উত্তর: প্রথমত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক জন্ম তারিখ অকাট্যভাবে জানা যায় নি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের ৯ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। রবিউল আওয়ালের ১২ তারিখ নয়। সুতরাং ১২ রবিউল আওয়াল ঈদে মীলাদুন নবী পালন করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিত্তিহীন।

দ্বিতীয়ত: শরী'আতের দিক থেকে যদি মীলাদ মাহফিল উদযাপন করা সঠিক হতো, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন

অথবা তাঁর উম্মতকে করতে বলতেন। আর কুরআনে বা হাদীসে অবশ্যই তা সংরক্ষিত থাকতো। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩﴾ [الحجر: ٩]

“আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯]

যেহেতু মীলাদের বিষয়টি সংরক্ষিত হয় নি, তাই বুঝা গেল যে, মীলাদ মাহফিল উদযাপন করা দীনের কোনো অংশ নয়। আর যা দীনের অংশ নয়, তা দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা বৈধ নয়। কীভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব, আল্লাহ তা বলে দিয়েছেন। তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা দীন। বিরাট অপরাধ। আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

“আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নি‘আমতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

অতএব, আমরা বলব যে, এ মীলাদ মাহফিল যদি পরিপূর্ণ দীনের অংশ হতো, তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বেই

তা বলে যেতেন। আর যদি তাঁর দীনের কোনো অংশ না হয় তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তা দীনের অংশ হতে পারেনা। যারা বলে মীলাদ মাহফিল পরিপূর্ণ দীনের অংশ, তবে বলতে হবে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাহলে এটা হবে আল্লাহর কথাকে মিথ্যা বলার শামিল।

কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা মীলাদ মাহফিল উদযাপন করে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান এবং ভালোবাসার জন্যই করে থাকে। রাসূলকে ভালোবাসা, তাকে সম্মান করা সবই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, কোনো মানুষের কাছে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সন্তান, পিতামাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ হতে প্রিয় না হয়, তা হলে সে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, তাই এর ভিতরে বিদ'আত তৈরি করা জায়েয নেই। তাছাড়া আমরা শুনতে পাই যে, এ মিলাদ মাহফিলে এমন বড় বড় অপছন্দনীয় কাজ হয়, যা শরী'আত বা কোনো সুস্থ বিবেকও সমর্থন করে না। এতে এমন এমন কবিতা পাঠ করা হয় যাতে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় খুবই বাড়াবাড়ি। অনেক সময় তাঁকে আল্লাহর চেয়েও বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। আরো দেখা যায় মীলাদ অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে উপস্থিত সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে যায়। তারা বিশ্বাস করে যে মীলাদ মাহফিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মোবারক এসে উপস্থিত হন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত

থাকাবস্থায় তাঁর সম্মানের জন্য দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণও দাঁড়াতেন না। অথচ তারা তাঁকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিতাবস্থায় দাঁড়নো পছন্দ করতেন না। তাহলে কীভাবে তাঁর মৃত্যুর পর এ রকম করা যেতে পারে?

মীলাদ নামের বিদ‘আতটি সম্মানিত তিন যুগ চলে যাওয়ার পর আবিস্কৃত হয়েছে। এতে রয়েছে এমন কিছু অন্যায় আমল, যা দীনের মৌলিক বিষয়গুলোতে আঘাত হানে। তাতে রয়েছে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশাসহ অন্যান্য অপকর্ম।

প্রশ্ন: (৯০) মাতৃ দিবসের উৎসব পালন করার হুকুম কী?

উত্তর: ইসলামী শরী‘আতে যে ঈদ রয়েছে, তা ব্যতীত সকল প্রকার ঈদ বা উৎসব পালন করা বিদ‘আত, যা সালাফে সালেহীনের যুগে ছিল না। হতে পারে এটি অমুসলিমদের কাছ থেকে আমদানী করা। তাই এতে অমুসলিমদের সাথে সদৃশ্য থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিমদের ঈদ মাত্র দু’টি। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা। তাছাড়া সপ্তাহিক ঈদ হলো শুক্রবার। এ তিনটি ঈদ ব্যতীত মুসলিমদের অন্য কোনো ঈদ নেই। এছাড়া যত ঈদ রয়েছে, ইসলামী শরী‘আতে সবই বিদ‘আত এবং প্রত্যাখ্যাত এবং বাতিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

“যে ব্যক্তি আমাদের দীনে এমন নতুন বিষয় তৈরি করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”[125]

তিনি আরো বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে, যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।”[126]

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উৎসব পালন করা বৈধ নয়। এতে ঈদের মতো আনন্দ প্রকাশ এবং উপহার বিনিময় করাও বৈধ নয়। মুসলমাদের অবশ্য কর্তব্য তাদের দীন নিয়ে গর্ববোধ করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যে দীন মনোনীত করেছেন, কোনো প্রকার বাড়ানো বা কমানো ছাড়াই তার অনুসরণ করা। প্রত্যেক মতবাদ এবং আহবায়কের পিছনে ছুটে যাওয়া মুসলিমদের উচিৎ নয়; বরং তার উচিৎ আল্লাহর দীন মোতাবেক জীবন গঠন ও পরিচালনা করা। অন্য ধর্মের কাউকে অনুসরণ না করা; বরং মানুষই তার অনুসরণ করবে এবং সে হবে তাদের জন্য আদর্শ স্বরূপ। কারণ, ইসলামী শরী‘আতকে সকল দিক থেকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

[125] সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

[126] সহীহ মুসলিম।

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

“আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নি‘আমতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

বছরে মাত্র একবার মাতৃ দিবস পালন করাই যথেষ্ট নয়; বরং সন্তানের ওপর মায়ের রয়েছে অনেক হক, যা আদায় করা একান্ত জরুরি। কোনো স্থান বা সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: (৯১) সন্তানদের জন্ম দিবস উপলক্ষে উৎসব পালন করা এবং বিবাহ উপলক্ষে উৎসব পালন করার হুকুম কী?

উত্তর: ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং সপ্তাহের ঈদ শুক্রবার ব্যতীত ইসলামে কোনো ঈদের অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে আরাফা দিবসকে হাজীদের ঈদ হিসেবে নাম রাখা হয়েছে। ঈদুল আযহার পরের তিন দিনও ঈদ হিসেবে পরিচিত কোনো মানুষের জন্ম দিবস পালন করা বা তার সন্তানের জন্ম দিবস পালন করা অথবা বিবাহ উপলক্ষে প্রতি বছর ঈদ বা উৎসব পালন করা শরী‘আত সম্মত নয়; বরং বিদ‘আতের নিটবর্তী বরং এসমস্ত কাজ বিধর্মী খৃষ্টানদের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কোনো ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গল মনে করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন: (৯২) জনৈক লোক একটি ঘরে বসবাস শুরু করার পর থেকেই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে আক্রান্ত হয়েছে আরো বড় বড় কয়েকটি মুসীবতে, যার কারণে সে এ ঘরে বসবাস করাকে অমঙ্গলের কারণ হিসাবে মনে করছে। তার জন্য কি ঘর ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে?

উত্তর: কোনো কোনো ঘর, যানবাহন এবং স্ত্রী লোকের ভিতরে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে অমঙ্গল নির্ধারণ করে থাকেন। হতে পারে ক্ষতির উদ্দেশ্যে কিংবা কল্যাণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। তাই এ ঘর বিক্রি করে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতে কোনো দোষ নেই। হতে পারে অন্য ঘরে চলে যাওয়াতেই তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ»

"তিনটি বস্তুর মধ্যে অকল্যাণ রয়েছে: ঘোড়া, স্ত্রীলোক এবং গৃহে।"[127]

কোনো যানবাহন অকল্যাণকর হতে পারে, কোনো কোনো স্ত্রীলোকের মাঝে অকল্যাণ থাকতে পারে এবং কোনো কোনো ঘরেও তা থাকতে পারে। মানুষ যখন এ জাতীয় কিছু দেখতে পেলে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কোনো না কোনো উদ্দেশ্যে আল্লাহ

[127] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ।

এ জাতীয় অকল্যাণ নির্ধারণ করে থাকেন। যাতে করে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন: (৯৩) উসীলার হুকুম কী?

উত্তর: প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিস্তারিতভাবে এর উত্তর দিতে চাই। উসীলার অর্থ হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্যে মাধ্যম গ্রহণ করা। উসীলা দু'প্রকার।

(১) শরী'আত সম্মত সঠিক উসীলা। তা হলো শরী'আত সম্মত সঠিক পন্থায় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছার চেষ্টা করা।

(২) শরী'আত বহির্ভূত উসীলা:

প্রথম প্রকারের উসীলা আবার কয়েক প্রকার।

(ক) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা: এটি দু'ভাবে হতে পারে।

(১) সাধারণভাবে আল্লাহর নামগুলো উল্লেখ করে দো'আ করা। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দো'আয় বলেছেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي»

“হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর পুত্র। আপনার হাতে আমার কর্তৃত্ব, আমার প্রতি আপনার নির্দেশ প্রতিফলন যোগ্য। আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ন্যায়নিষ্ঠ। আপনার সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির উসীলায় আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি, যেগুলো আপনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন অথবা তা আপনার কোনো সৃষ্টিকে জানিয়েছেন, অথবা কুরআনে তা নাযিল করেছেন, অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে তা সংরক্ষিত করে রেখেছেন। আপনি আমার জন্য কুরআনকে হৃদয়ের উর্বরতা স্বরূপ করুন---------।[128]

এখানে আল্লাহর প্রতিটি নামের উসীলায় আল্লাহর কাছে দো‘আ করা হয়েছে।

(২) আল্লাহর নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁর কাছে দো‘আ করা: যেমন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাতে পঠিতব্য দো‘আ শিক্ষা দেওয়ার আবেদন জানালে তিনি নিম্নের দো‘আটি শিক্ষা দিলেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

“হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর অবিচার করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং

[128] আহমাদ, হাকেম, সনদ সহীহ।

রহম করুন। আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়।”[129]

এখানে আল্লাহর দু’টি নাম। যথা: ‘গাফূর’ এবং ‘রাহীম’ এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত কামনা করা হয়েছে।

(খ) আল্লাহর গুণাবলীর মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা: এটি দু’ভাবে হতে পারে। (১) এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আপনার সুন্দর নামগুলোর মাধ্যমে এবং উন্নত গুণাবলীর মাধ্যমে প্রার্থনা করছি। এরপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন উল্লেখ করবে।

(২) নির্দিষ্ট কোনো গুণাবলীর উসীলা দিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রার্থনা করা। যেমন, হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي»

“হে আল্লাহ! আপনার ইলম এবং মাখলুকের উপর আপনার ক্ষমতার উসীলা দিয়ে এ দো‘আ করছি যে, আমার জীবিত থাকা যদি আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি জানেন যে, আমার মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণর, তাহলে আমাকে মৃত্যু দান করুন।”[130]

---

[129] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল আজান।

[130] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ।

এখানে ইলম ও কুদরত- এ দু'টি গুণের মাধ্যমে উসীলা দেওয়া হয়েছে। আর এটি প্রার্থনার সাথে খুবই সংগতিপূর্ণ।

(গ) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে উসীলা দেওয়া: এভাবে বলবে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার ওপর এবং আপনার রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। এ ঈমানের উসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তা'আলা ঈমানের উসীলা দিয়ে দো'আ করার নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۝١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۝١٩١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝١٩٢ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ۝١٩٣﴾ [ال عمران: ١٩٠، ١٩٣]

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নমে নিক্ষেপ করলে তাকে অপমানিত করলে, আর যালেমদের জন্যে তো কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! আমরা

নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে যে, তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন, তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! অতঃপর আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমাদের সকল দোষ-ক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯০-১৯৩]

এখানে গুনাহ মাফ, দোষ-ক্রটি দূর করা এবং নেক লোকদের সাথে যেন মৃত্যু হয় তার জন্য ঈমানের উসীলা দিয়ে দো‘আ করা হয়েছে।

(ঘ) সৎ আমলের উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা: এখানে তিন ব্যক্তির ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। উপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে গুহা থেকে তাদের বের হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎ আমল তুলে ধরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছিল। একজন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার উসীলা দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার উসীলা দিল এবং তৃতীয়জন তার চাকরের বেতন পূর্ণভাবে প্রদান করার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আ করা আরম্ভ করল। তারা প্রত্যেকেই দো‘আয় বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এ আমলটুকু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এভাবে দো‘আ করার পর পাথরটি সরে গেল এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসল।

এ ঘটনাটিতে সৎ আমলকে উসীলা ধরে দো‘আ করার কথা প্রমাণিত হয়।

(ঙ) নিজের অবস্থা আল্লাহর কাছে তুলে ধরে উসীলা দেওয়া: অর্থাৎ দো‘আকারী যে অবস্থায় রয়েছে, তা আল্লাহর কাছে তুলে ধরবে। যেমন, মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ﴾ [القصص: ٢٤]

“হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ২৪]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজের দুর্বলতাকে তুলে ধরে উসীলা দিয়েছেন। আল্লাহ তার কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبٗا وَلَمۡ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّٗا ٤﴾ [مريم: ٤]

“তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে, বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে, হে আমার রব আপনাকে ডেকে আমি কখনো বিফল মনোরথ হইনি।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪]

উসীলার যে সমস্ত প্রকার উপরে বর্ণিত হয়েছে, তার সবই বৈধ।

(চ) সৎকর্মশীলদের দো‘আর উসীলা দেওয়া: সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দো‘আ চাইতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, জুমু‘আর দিন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে, পশুপাল পিপাসায় মারা যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দো'আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত উঠালেন এবং তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে নামার আগেই বৃষ্টি বর্ষিত হলো এবং তাঁর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরতে থাকল এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকল। পরবর্তী জুমু'আয় সেই ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! পানিতে সব কিছু ডুবে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দো'আ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, أَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশের উঁচু ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়' -এ বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের এক পাশের দিকে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল। মানুষেরা সূর্যের আলোতে বের হয়ে আসল।[131]

আরো অনেক ক্ষেত্রে সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিশেষভাবে দো'আ চেয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন যে, তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা

[131] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইস্তিস্কার সালাত।

হিসেবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি এও বললেন যে, তারা ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়-ফুঁক করে না, চিকিৎসার জন্য লোহা গরম করে দাগ দেয় না এবং পাখি উড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করে না; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে। এ কথা শুনে উকাশা ইবন মিহসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। এটাও এক প্রকার উসীলা। দো'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায় এমন কোনো সৎ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার কাছে দো'আ চাওয়া এবং তার দো'আর উসীলা গ্রহণ করা জায়েয আছে। কোনো মুসলিম যদি তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দো'আ করে, তবে ফিরিশতাগণ আমীন বলতে থাকেন।

(২) অবৈধ উসীলা:

শরী'আত সম্মত নয়, এমন জিনিসের মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা অবৈধ। কেননা এ সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে উসীলা দেওয়া বিবেক এবং শরী'আত সম্মত নয়। যেমন মৃত ব্যক্তির কাছে দো'আ চাওয়ার মাধ্যমে উসীলা গ্রহণ করা। এধরণের উসীলা দেওয়া জায়েয নেই। কারণ, মৃত ব্যক্তির কাছে দো'আ চাওয়া একটি জঘণ্য মুর্খতাপূর্ণ কাজ। কেননা মানুষ যখন মারা যায়, তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষে কারও জন্য দো'আ করা সম্ভব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষেও মারা যাওয়ার পর কারও জন্য দো'আ করা সম্ভব

নয়। তাই সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর কাছে এসে দো‘আ চান নি। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আমলে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তাঁর উসীলা দিয়ে আমরা আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম এবং আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করতেন। এখন আমরা নবীর চাচার উসীলায় আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে বৃষ্টি প্রদান করুন। তারপর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দাঁড়ালেন এবং দো‘আ করলেন। মৃতের কাছে দো‘আ চাওয়া যদি বৈধ হতো, তা হলে কোনো ক্রমেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাদ দিয়ে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে দো‘আ চাওয়া বৈধ মনে করতেন না। কারণ, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর দো‘আর চেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো‘আ কবূল হওয়া অধিক উপযোগী। মোটকথা মৃত ব্যক্তির উসীলা দিয়ে দো‘আ করা জায়েয নেই।

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের উসীলা দেওয়াও জায়েয নেই। কারণ, আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান থাকা দো‘আকারীর জন্য কোনো উপকারে আসবে না। দো‘আকারীর জন্য এমন বিষয়ের উসীলা দেওয়া উচিৎ, যা তার কাজে আসবে। সুতরাং এভাবে বলা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি এবং আপনার রাসূলের প্রতি আমার ঈমান আনয়নের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করুন। এ জাতীয় অন্যান্য শরী‘আত সম্মত বিষয়ের উসীলা দেওয়া বৈধ।

প্রশ্ন: (৯৪) কাউকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার মূলনীতি কী?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত ব্যক্তি বা বিষয় হতে নিজেকে সম্পর্ক মুক্ত ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ তা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা। আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا﴾ [الممتحنة: ٤]

"তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তার সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যাতীত যার ইবাদাত কর, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" [সূরা আল-মুমতাহানাহ, আয়াত: ৪] আর এটা হবে মুশরিকদের সাথে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُۥ﴾ [التوبة: ٣]

“আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩]

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের ওপর আবশ্যক হলো কাফির-মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এমনিভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। যদিও তা কুফুরীর পর্যায়ে না যায়। যেমন, পাপাচারিতায় লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧]

“কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৭]

যদি কোনো মুমিনের কাছে ঈমানের সাথে সাথে পাপাচারিতা থাকে, তাহলে আমরা মুমিন হওয়ার কারণে তাকে ভালোবাসব এবং পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঘৃণা করব। এ ধরণের সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত হলো, যেমন আমরা অরুচীকর ঔষধ গ্রহণ করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা পান করি। কারণ, তাতে আরোগ্যের আশা করা যায়।

কোনো কোন মানুষ পাপী মুমিনকে কাফির-মুশরেকের চেয়েও ঘৃণা করে। এটি খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং বাস্তবতার বিপরীত। কাফির আল্লাহর শত্রু, রাসূলের শত্রু এবং সমস্ত মুমিনের শত্রু। তাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾ [الممتحنة: ١]

“হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য আগমণ করেছে, তারা তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করে, এ অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের রবর প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায়।” [সূরা আল-মুমতাহানাহ, আয়াত: ১]

আল্লাহ বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ۝٥١﴾ [المائدة: ٥١]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরে বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৫১]

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ﴾ [البقرة: ١٢٠]

"ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ না করবেন।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২০]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَـٰنِكُمۡ كُفَّارًا﴾ [البقرة: ١٠٩]

"আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসা বশতঃ কামনা করে যে, মুসলিম হওয়ার পর তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০৯]

এমনিভাবে প্রতিটি নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক। আমাদের জন্যে হারাম কাজের প্রতি ভালোবাসা রাখা বৈধ নয়। আমরা পাপী

মুমিনের পাপকাজকে ঘৃণা করি এবং তা থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে রাখি; কিন্তু আমরা তাকে ঈমানের কারণে ভালোবাসি।

প্রশ্ন: (৯৫) অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কী? পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের বিধান কী?

উত্তর: তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধ:

1) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইলম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।
2) তার কাছে এমন দীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।
3) অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না, তা হলে কোনো অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোনো দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

প্রশ্ন: (৯৬) যে ব্যক্তি কাফিরদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আপনার উপদেশ কী?

উত্তর: যে মুসলিম ভাই অমুসলিমদের সাথে চাকুরী করে, তার জন্য আমার উপদেশ হলো, সে এমন একটি কর্মক্ষেত্র তালাশ করবে, যা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলদের শত্রু হতে মুক্ত। যদি পেয়ে যায়, তাহলে কতইনা সুন্দর। আর যদি না পায়, তাহলে কাফিরদের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে চাকুরী করতে কোনো অসুবিধা নেই। তারা তাদের কাজ করবে এবং সেও আপন কর্মে লিপ্ত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, তার অন্তরে যেন কাফিরদের প্রতি কোনরূপ ভালোবাসা না থাকে। সালাম এবং তার উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে সে ইসলামী নীতিমালার অনুসরণ করে চলবে। তাদের জানাযায় শরীক হবে না এবং তাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করবে না। বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। সাধ্যানুসারে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন: (৯৭) কাফিরদের কাছে যে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে, অবৈধতায় পতিত না হয়ে তা দ্বারা কীভাবে আমরা উপকৃত হব?

উত্তর: আল্লাহর শত্রু কাফিররা যে সমস্ত কাজ-কর্ম করে, তা তিন প্রকারঃ-

১. ইবাদাত ২. অভ্যাস এবং ৩. কারিগরি ও শিল্পকলা। ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোনো ক্রমেই কাফিরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে, তার জন্য বিরাট ভয়ের

কারণ রয়েছে। ইহা তাকে ইসলাম থেকে বেরও করে দিতে পারে। লেবাস-পোষাক, চাল-চলন ও রীতিনীতি ইত্যাদির কোনো ক্ষেত্রেই কাফিরদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

"যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৩২] তবে যাতে জনগণের উপকার রয়েছে, তা কাফিরদের কাছ থেকে শিক্ষা করাতে কোনো দোষ নেই। কারণ, তা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া ইবাদাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তাতে দলীল থাকতে হবে। আর অভ্যাস বা পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হলো তা সবই হালাল। একমাত্র শরী'আত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু হারাম করলে সেটা ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন: (৯৮) আরব উপ-দ্বীপে অমুসলিমদের প্রবেশ করানোর হুকুম কী?

উত্তর: অমুসলিমদেরকে আরব উপ-দ্বীপে প্রবেশ করানোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধীতা করার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেন,

«أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ»

---

[132] আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুল লিবাস।

“তোমরা মুশরিকদেরকে আরব উপ-দ্বীপ থেকে বের করে দাও।”[133]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا»

“আমি অবশ্যই ইয়াহূদী-নাসারাদেরকে আরব উপ-দ্বীপ থেকে বের করে দেব। তাতে মুসলিম ব্যতীত অন্য কোনো মানুষকে থাকতে দেব না।”[134]

তবে যদি কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় এবং উক্ত প্রয়োজন পূরণ করার মত কোনো মুসলিম পাওয়া না যায় তবে তাদেরকে আরব উপ-দ্বীপে প্রবেশ করানোতে কোনো দোষ নেই। তবে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা যাবে না। যেখানে শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলা হয়েছে, সেখানেও যদি আকীদা কিংবা চরিত্রগত কোনো ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাদেরকে আরব উপ-দ্বীপে প্রবেশ করানো হারাম। কেননা জায়েয বস্তুতে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তখন তা হারামে পরিণত হয়ে যায়। কাফিরদেরকে এখানে আনা হলে যে সমস্ত ভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হলো তাদেরকে ভালোবাসা, তাদের কুফুরীতে সন্তুষ্ট থাকা এবং দীনের প্রতি দৃঢ়তা চলে যাওয়া ইত্যাদি। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বিশ্বে যথেষ্ট পেশাদার লোক রয়েছে। আমরা তাদেরকেই যথেষ্ট মনে করতে পারি।

---

[133] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়ের।

[134] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সায়ের।

ধর্ম প্রত্যাখ্যানই কি উন্নতির চাবিকাঠি?

প্রশ্ন: (৯৯) কিছু সংখ্যক মানুষ দাবী করে যে, দীনের অনুসরণই মুসলিমদেরকে উন্নতি থেকে পিছিয়ে রেখেছে। তাদের দলীল হলো পাশ্চাত্য দেশসমূহ সকল প্রকার দীনকে প্রত্যাখ্যান করেই বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এও বলে যে, পাশ্চাত্য বিশ্বেই বেশি করে বৃষ্টি ও ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই?

উত্তর: দুর্বল ঈমানদার, ঈমানহীন এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এ ধরণের কথা বলতে পারে। মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম যুগে দীনকে আঁকড়ে ধরেই সম্মান-মর্যাদা এবং শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিমদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেই বর্তমান পাশ্চাত্য বিশ্ব এতো উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ তাদের সঠিক দীনকে ছেড়ে দিয়ে আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ্‌আতে লিপ্ত হওয়ার কারণেই সমস্ত জাতির পিছনে পড়ে আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মুসলমানেরা যদি আবার তাদের দীনের দিকে ফিরে যায়, তা হলে আমারই সম্মানিত হবো এবং সমস্ত জাতির উপরে আমরা রাজত্ব করতে সক্ষম হবো। আবু সুফিয়ান যখন রোমের বাদশা হিরাক্লিয়াসের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের পরিচয় তুলে ধরল, তখন রোমের বাদশা মন্তব্য করে বলল যে, তুমি যা

বলছ, তা সত্য হলে অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পর্যন্ত চলে আসবে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে, আমাদের দীন তা গ্রহণ করতে বাধা দেয় না। আফসোসের কথা হলো মুসলিমগণ দীন-দুনিয়া উভয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব উন্নতি সাধন করতে ইসলাম কখনো বিরোধীতা করে না। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ﴾ [الانفال: ٦٠]

“আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়ার মধ্য থেকে। তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদেরকে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ﴾ [الملك: ١٥]

“তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার দিক-দিগন্তে ও রাস্তাসমূহে চলাফেরা কর এবং তাঁর দেওয়া রিযিক আহার কর।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]

তিনি আরো বলেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]

“তিনি তোমাদের জন্য ভূপৃষ্টের সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৯]

এ অর্থে আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা মানুষকে পৃথিবীর সকল বস্তু উপার্জন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রতি উৎসাহ যোগায়। দীন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নয় বরং তা দ্বারা পার্থিব জীবনে উপকৃত হওয়ার জন্য। অমুসলিম রাষ্ট্রের লোকেরা মৌলিক দিক থেকে কাফির। দীনের দাবী করে থাকে, তাও বাতিল ধর্ম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] আহলে কিতাবীরা যদিও অন্যান্য কাফির-মুশরিকদের থেকে আলাদা, কিন্তু পরকালে কোনো পার্থক্য হবে না। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শপথ করে বলেছেন, এ উম্মতের কোনো ইয়াহূদী-নাসারা যদি তাঁর দাওয়াত শ্রবণ করার পরও ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তারা নিজেদেরকে ইয়াহূদী বলে দাবী করুক বা নাসারা হিসেবে দাবী করুক, সবই সমান।

অমুসলিমরা বৃষ্টিসহ অন্যান্য যে ধরণের নি‘আমতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তার কারণ হলো এটা তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। তাদের ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করা হয়ে থাকে। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে দেখে বললেন, হে আল্লাহর নবী! পারস্য এবং রোমের বাদশাহগণ অসংখ্য নি'আমতের ভিতরে রয়েছে। আর আপনি এ জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। উত্তরে তিনি বললেন, হে উমার এদেরকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নি'আমত দেওয়া হয়েছে। তুমি কি এতে রাজী নও যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য হবে আখিরাত।[135]

তাছাড়া তুমি কি দেখ না যে, তাদের মধ্যে হয়ে থাকে অনাবৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্পসহ নানা বিপদাপদ? যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় এবং রেডিওতে শুনা যায়। উল্লিখিত প্রশ্নের মত যারা প্রশ্ন করে, তারা অন্ধ। আল্লাহ তাদের অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে তারা বাস্তব অবস্থা দেখতে পায় না। তাদের জন্য আমার নসীহত এ যে, তারা যেন মৃত্যু আসার পূর্বেই তাওবা করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের দিকে ফিরে আসলেই আমাদের জন্য সম্মান, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব অর্জিত হবে। উপরোক্ত সন্দেহ পোষণকারীর এটাও বিশ্বাস করা জরুরি যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের কাফিররা বাতিলের ওপর রয়েছে। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পরকালে পূর্ণভাবে শাস্তি প্রদানের নিমিত্তেই তাদেরকে দুনিয়ার নি'আমত প্রদান করা

---

[135] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মাযালিম।

হয়েছে। যখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে, তখন তাদের দুঃখ ও হতাশা বেড়ে যাবে। তাদেরকে নি'আমত প্রদানের উদ্দেশ্য এটিই।[136]

প্রশ্ন: (১০০) কতক লোক বলে যে, অন্তর ঠিক থাকলে শব্দের উচ্চারণ ঠিক করার বেশি গুরুত্ব নেই -এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

উত্তর: শব্দের উচ্চারণ বলতে যদি তার উদ্দেশ্য হয় আরবী ভাষা, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তার কারণ এ যে, আকীদা ঠিক থাকলে আরবী ভাষার সঠিক উচ্চারণ জরুরি নয়। অর্থ বোঝা গেলেই চলবে। আর যদি শব্দের উচ্চারণ বলতে এটা উদ্দেশ্য হয় যে, অন্তরের আকীদা যেহেতু ঠিক আছে, কাজেই মুখে যা ইচ্ছা তা উচ্চারণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। যদিও তা কুফুরী বাক্য হয়ে থাকে। তবে এটি ঠিক নয়। আমরা বলব যে, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখের ভাষাও ঠিক করতে হবে।

প্রশ্ন: (১০১) 'আল্লাহ আপনাকে চিরস্থায়ী করুন'- একথাটি বলা কি ঠিক?

---

136 আল্লাহর এ বাণীটি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, তিনি বলেন, ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤﴾ [الانعام: ٤٤] "যখন ওরা ভুলে গেল ঐ বিষয় যার উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা তাদের জন্য সকল কিছুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তা নিয়ে তারা আনন্দ-খুশিতে মত্ত হয়ে পড়ল, তাদেরকে আমরা হঠাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৪৪]

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যটি বলা ঠিক নয় বরং এটি দো‘আর মধ্যে সীমালংঘন করার শামিল। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ۝٢٦ وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ۝٢٧﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব রবের চেহারা ব্যতীত।” [সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৬-২৭]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا جَعَلۡنَا لِبَشَرٖ مِّن قَبۡلِكَ ٱلۡخُلۡدَۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلۡخَٰلِدُونَ ۝٣٤﴾ [الانبياء: ٣٤]

“আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৪]

প্রশ্ন: (১০২) আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে কোনো কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর: আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে মানুষ দুনিয়ার কোনো জিনিস চাইবে, এ থেকে আল্লাহর চেহারা অনেক বড়। আল্লাহর চেহারার দোহাই দিয়ে (জান্নাত ছাড়া অন্য) কোনো কিছু চাওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন: (১০৩) আপনি দীর্ঘজীবি হোন –এ কথা বলার হুকুম কী?

উত্তর: সাধারণভাবে একথাটি বলা ঠিক নয়। কারণ, হায়াত দীর্ঘ হওয়া কখনো ভালো হয় আবার কখনো মন্দ হয়। ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার বয়স বাড়ল, কিন্তু আমল মন্দ হলো। যদি বলে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর আপনার হায়াত দীর্ঘ হোক, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

একত্রে (الله) এবং (محمد) লেখার বিধান কী?

প্রশ্ন: (১০৪) আমরা অনেক সময় দেখি যে, গাড়ী বা দেওয়ালে এক দিকে (الله) এবং অন্য দিকে (محمد) লেখা থাকে, এমনিভাবে কাপড়ের টুকরায়, বইয়ের উপর এবং কুরআন মযীদের গেলাফের উপরও লেখা হয়ে থাকে। এরকমভাবে লেখা কি ঠিক?

উত্তর: এভাবে লেখা জায়েয নেই। কেননা এধরণের লেখাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সমান করে দেওয়া হয়ে থাকে এবং অজ্ঞ লোকেরা এভাবে লেখা দেখে উভয় নামকে মর্যাদার দিক থেকে সমান মনে করতে পারে। তাই প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মুছে ফেলা উচিৎ। বাকী থাকবে শুধু আল্লাহর নাম। সুফীরা শুধু আল্লাহু, আল্লাহু যিকির করে থাকে। এজন্য আল্লাহু শব্দটিকেও মুছে ফেলতে হবে। সুতরাং গাড়ীতে বা দেওয়ালে বা কাপড়ে বা অন্য কোথাও 'আল্লাহু' বা 'মুহাম্মাদ' কোনটিই লেখা যাবে না।

প্রশ্ন: (১০৫) আল্লাহ আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, এ বাক্যটি বলা যাবে কি না?

উত্তর: এ বাক্যটি উচ্চারণ করা জায়েয নেই। কারণ, এতে ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়, তাই তিনি প্রশ্ন করেন। এটি একটি বিরাট অপছন্দনীয় বাক্য। যদিও বক্তা এধরণের

উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু বাক্যের মাধ্যমে উক্ত অর্থ বুঝা যায়। তাই এভাবে বলা বর্জন করা উচিৎ।

মৃত ব্যক্তিকে মরহুম বলার হুকুম কী?

প্রশ্ন: (১০৬) মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মরহুম বলা বা আল্লাহ তাকে রহমত দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন অথবা অমুক ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের দিকে চলে গেছেন –এ ধরণের কথা বলার হুকুম কী?

উত্তর: উক্ত কথাগুলো বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, এতে কেবল তার জন্য কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। দৃঢ়তার সাথে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয় নি। কারণ, তা জায়েয নেই।

প্রশ্ন: (১০৭) ভাষণের শুরুতে 'দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে বলছি' –এ কথাটি বলা কি ঠিক?

উত্তর: বক্তার উদ্দেশ্য যদি হয় যে, সে দেশ ও জাতির মুখপত্র হিসেবে কথা বলছে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি বরকতের আশায় অথবা সাহায্য চাওয়ার নিয়তে কথাটি উচ্চারণ করে, তাহলে শির্কে পরিণত হবে। বক্তার অন্তরে দেশ-জাতির সম্মান যদি আল্লাহর সম্মানের মত হয় তাহলে বড় শির্কে পরিণত হতে পারি।

প্রশ্ন: (১০৮) অনেক মানুষ বলে থাকে "আপনি আমাদের জন্য বরকত স্বরূপ" এভাবে বলার হুকুম কী?"

উত্তর: একথার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আপনার আগমণের কারণে আমরা বরকত লাভ করলাম, তাহলে অসুবিধা নেই। কারণ, বরকতকে মানুষের দিকে সম্পৃক্ত করা জায়েয আছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর গলার হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে যখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো, তখন উসাইদ ইবন হুজায়ের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, হে আবু বকর পরিবারের নারী! এটিই আপনাদের প্রথম বরকত নয়।[137]

বরকতের অনুসন্ধান দু’ভাবে হতে পারে।

১) শরী‘আত সম্মত বলে কোনো জিনিস থেকে বরকত হাসিল করা: যেমন, আল-কুরআনুল কারীম। আল্লাহ বলেন,

﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٌ﴾ [الانعام: ٩٢]

“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯২]

কুরআনের বরকত হলো, যে ব্যক্তি তাকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে এবং কুরআন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তার জন্য বিজয় অনিবার্য। এর মাধ্যমে আল্লাহ অনেক জাতিকে শির্ক থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কুরআনের অন্যতম বরকত হলো, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে দশটি নেকী অর্জন করবে।

২) বাহ্যিক কোনো জানা জিনিস থেকে বরকত হাসিল করা: যেমন, দীনি ইলম। কোনো ব্যক্তির ইলম এবং কল্যাণের পথে দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে বরকত হাসিল করা। উসায়েদ ইবন হুজায়ের বলেন, হে আবু

---

137 সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত তায়াম্মুম।

বকরের বংশধর! এটিই তোমাদের প্রথম বরকত নয়। কেননা কোনো কোনো মানুষের হাতে এমন বরকত প্রকাশিত হয়, যা অন্যের হাতে প্রকাশিত হয় নি।

মৃত ব্যক্তি বা মিথ্যুকদের কল্পিত ওলী থেকে বরকত লাভের ধারণা করা সম্পূর্ণ বাতিল। এর কোনো অস্তিত্ব নেই। কখনো বরকতের নামে শয়তানের সহযোগীতায় ভন্ডরা মানুষকে গোমরাহ করার জন্য কিছু কিছু অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়ে থাকে। সঠিক বরকত এবং ভণ্ডামীর মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি হলো, যার কাছ থেকে কারামাত প্রকাশিত হলো, তার ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে যদি আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সুন্নাহর অনুসারী হবে এবং বিদ‘আত থেকে মুক্ত হবে, আল্লাহ তার হাতে এমন বরকত প্রকাশ করবেন, যা অন্যের হাতে প্রকাশ করবেন না। আর যদি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধীতাকারী হয় অথবা বাতিলের দিকে আহ্বানকারী হয় এবং তা সত্বেও তার হাতে বাহ্যিকভাবে কোনো ভালো জিনিস প্রকাশিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি শয়তানের পক্ষ থেকে বাতিলের সহযোগিতা মাত্র।

প্রশ্ন: (১০৯) মানুষ বলে থাকে ‘তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে’ এ ধরণের কথা বলার বিধান কী?

উত্তর: তাকদীরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে –এ ধরণের কথা বলা ঠিক নয়। কারণ, তাকদীর পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট। তাই অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলা হবে কীভাবে? বরং বলা হবে তাকদীর আগমণ করেছে বা বিজয় লাভ

করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলাও ঠিক হবে না; বরং বলা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়েছে।

‘চিন্তার স্বাধীনতা’ কথাটি কতটুকু সঠিক?

প্রশ্ন: (১১০) ‘চিন্তার স্বাধীনতা’ সম্পর্কে আমরা শুনে থাকি এবং পত্রিকায় পড়ে থাকি। মূলতঃ এটি আকীদা গ্রহণের স্বাধীনতার দিকে আহ্বান মাত্র। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর: এ ব্যাপারে আমাদের কথা হলো, যে ব্যক্তি আকীদার স্বাধীনতার দাবী করে এবং যে কোনো দীনে বিশ্বাসের অধিকার রাখে বলে মনে করে, সে কাফির। কারণ, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন ব্যতীত অন্য দীন গ্রহণ করা বৈধ মনে করে, সে কাফিরে পরিণত হবে। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা না করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

দীনের বিষয় চিন্তাপ্রসূত বিষয় বা কোনো মতবাদ নয়। এটা আল্লাহর অহী, যা আল্লাহ তাঁর নবীদের উপর নাযিল করেছেন যেন মানুষ তার অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম একটি চিন্তাধারা, খৃষ্ট ধর্ম একটি চিন্তা ধারা এবং ইয়াহূদীবাদ একটি চিন্তা ধারা এভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এই যে, আসমানী শরী‘আতসমূহ নিছক মানবীয় চিন্তাপ্রসূত বিষয়। আসমানী দীনসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী স্বরূপ আগমণ করেছে।

মোটকথা, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করবে যে, সে নিজের খেয়াল-খুশী মত যে কোনো দীনে বিশ্বাস করতে পারে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন গ্রহণ করবে, তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾ [ال عمران: ١٩]

“ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তা করবে আলিমগণ তাকে সুস্পষ্ট কাফির হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছেন।

প্রশ্ন: (১১১) মুফতীর নিকট ‘এ বিষয়ে ইসলামের হুকুম কী বা ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গি কী’ এ ধরণের বাক্য দিয়ে প্রশ্ন করার বিধান কী?

উত্তর: এভাবে বলা উচিৎ নয়। হতে পারে সে ফাতওয়া দিতে ভুল করবে। কাজেই তার ভুল ফাতওয়া ইসলামের বিধান হতে পারে না। তবে মাসআলাতে যদি সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন, মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? উত্তর হবে এ বিষয়ে ইসলামের বিধান হলো হারাম।

প্রশ্ন: (১১২) ‘পরিস্থিতির ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে’ ‘তাকদীদেরর ইচ্ছানুপাতে এ রকম হয়েছে’ এ ধরণের কথা বলার হুকুম কী?

উত্তর: কথাগুলো অপছন্দনীয় এবং শরী'আত সম্মত নয়। কারণ, পরিস্থিতির কোনো ইচ্ছা নেই। এমনিভাবে তাকদীরেরও নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই। আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। যদি বলে 'তাকদীরের লিখন এরকম ছিল', তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: (১১৩) কাউকে শহীদ বলার হুকুম কী?

উত্তর: কাউকে শহীদ বলা দু'ভাবে হতে পারে।

(১) নির্দিষ্ট কোনো কাজকে উল্লেখ করে শহীদ বলা। এভাবে বলা, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে শহীদ, প্লেগ রোগে মারা গেলে শহীদ---। এভাবে বলা জায়েয আছে। কেননা এখানে আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী সাক্ষ্য প্রদান করছেন।

(২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দিষ্ট করে যাকে শহীদ বলেছেন এবং সমস্ত মুসলিম যাকে শহীদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে শহীদ বলা জায়েয নেই। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যে, "একথা বলা যাবে না যে অমুক ব্যক্তি শহীদ"। ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেন, অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে অবগত হওয়া ব্যতীত অকাট্যভাবে কারও জন্য শাহাদাতের ফায়সালা দেওয়া যাবে না। তিনি সম্ভবত উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর একটি ভাষণের দিকে ইংগিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে বলে থাক অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে। খবরদার এভাবে বলো না। কারণ, তার অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে

পারে। তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো বল যে, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মারা গেল অথবা জীবন দিল সে শহীদ”।[138]

কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হলে সে বিষয়ে ইলম থাকতে হবে। শহীদ হওয়ার শর্ত হলো আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা। আর এটি অন্তরের গোপন অবস্থা। তা জানার কোনো উপায় নেই। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ»

“আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে।”[139]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»

“ঐ সত্ত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শরীরে জখম হবে, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ক্ষত স্থান হতে রক্ত

---

[138] মসনাদে আহমাদ।

[139] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

ঝরতে থাকবে, রং হবে রক্তের, কিন্তু তার গন্ধ হবে মিসকের সুঘ্রাণের ন্যায়।”[140]

যারা জিহাদ করে নিহত হয়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা ভালো। তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাদেরকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করি না। তাদের প্রতি খারাপ ধারণাও করি না। তবে দুনিয়াতে তাদের উপর শহীদের হুকুম প্রযোজ্য হবে। জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে তার পরিহিত কাপড়েই রক্ত সহকারে দাফন করা হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে না। আর যদি অন্যভাবে শহীদ হয়ে থাকে, তবে তাকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন পরানো হবে এবং জানাযার সালাত পড়া হবে।

কাউকে ‘শহীদ’ হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ তাকে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে শহীদ বলেছেন, তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে শহীদ বলেন না। ইমাম ইবন তাইমিয়ার মতে মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে যাকে শহীদ বলা হয়েছে, তাকে শহীদ বলা যাবে।

প্রশ্ন: (১১৪) ‘হঠাৎ সাক্ষাত হয়ে গেল’, ‘হঠাৎ এসে গেলাম’ এ ধরনের কথা বলা জায়েয কি না?

উত্তর: আমরা এতে নাজায়েযের কিছু মনে করি না। মনে হয় এ ধরণের কিছু হাদীস পাওয়া যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[140] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ।

আমাদেরকে হঠাৎ দেখে ফেললেন। তবে এ মূহুর্তে নির্দিষ্ট কোনো হাদীস আমার মনে আসছে না। মানুষ কোনো কাজকে হঠাৎ মনে করতে পারে। কারণ, সে গায়েবের খবর জানে না। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে না। কারণ, তিনি সকল বিষয়ে অবগত আছেন। প্রতিটি বিষয় আল্লাহর কাছে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। তাই হঠাৎ করে তাঁর কোনো কাজ হতেই পারে না।

প্রশ্ন: (১১৫) ইসলামী চিন্তাধারা, ইসলামী চিন্তাবিদ –এ ধরণের কথা বলা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর: ইসলামী চিন্তাধারা বা অনুরূপ শব্দ বলা যাবে না। ইসলামকে যদি চিন্তাধারা বলি, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, এটি চিন্তাপ্রসূত বিষয় যা গ্রহণ বা বর্জন করার সম্ভাবনা রাখে। এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাক্য, যা ইসলামের শত্রুরা আমাদের ভিতরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে অথচ আমরা জানি না।

কাউকে ইসলামী চিন্তাবিদ বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। একজন মুসলিম চিন্তাবিদ হবে এতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন: (১১৬) দীনকে খোসা এবং মূল এ ভাবে ভাগ করা কি ঠিক?

উত্তর: দীনকে খোসা এবং মূল হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করা বৈধ নয়। দীনের সবই মূল এবং মানব জাতির জন্য উপকারী। তা মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। পোষাক এবং বাহ্যিক বেশ-ভুশার ক্ষেত্রেও যদি মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুসরণের নিয়ত করে, তাহলে তাতেও ছাওয়াব রয়েছে। খোসা

এমন জিনিসকে বলা হয়, যা উপকারী নয় বলে ফেলে দেওয়া হয়। ইসলামের ভিতরে বর্জনীয় কোনো কিছু নেই। সবই মানুষের জন্য কল্যাণকর। যারা এ ধরণের কথার প্রচলন ঘটায়, তাদের ভালোভাবে ভেবে দেখা দরকার। যাতে করে তারা সত্যের সন্ধান পেতে পারে এবং তার অনুসরণ করতে পারে। তাদের উচিৎ ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া বর্জন করা। এ কথা ঠিক যে, ইসলামের মধ্যে কিছু জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ইসলামের রুকনসমূহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ»

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আর তা হলো (১) এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং (৫) কা‘বা ঘরের হজ পালন করা।”[141]

দীনের মধ্যে এমন জিনিসও রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তাতে খোসার মতো এমন কিছু নেই যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে না, তার সম্পূর্ণটাই উপকারী।

[141] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে কথা হলো নিঃসন্দেহে তা একটি ইবাদাত। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লম্বা করার আদেশ দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি আদেশ পালন করাই ইবাদাত, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। দাড়ি রাখা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা হারুন আলাইহিস সালামের উক্তি বর্ণনা করে বলেন,

﴿يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ﴾ [طه: ٩٤]

"হে আমার ভাই! আমার দাড়িতে ও মাথায় ধরে টান দিবেন না।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৯৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, দাড়ি লম্বা করা স্বভাবগত বিষয়ের অন্তর্গত। সুতরাং দাড়ি লম্বা করা একটি ইবাদাত, অভ্যাস নয় এবং তা খোসাও নয়। যেমনটি ধারণা করে থাকে কতিপয় লোক।

প্রশ্ন: (১১৭) 'তাকে সর্বশেষ বিছানায় দাফন করা হলো' মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এ কথাটি বলার হুকুম কী?

উত্তর: মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে একথাটি বলা সম্পূর্ণ হারাম। যদি তুমি বল সে তার শেষ গন্তব্যে চলে গেছে, তার অর্থ হলো কবরের পরে আর কিছু নেই। এ ধরণের কথা পুনরুত্থান অস্বীকার করার শামিল। ইসলামী আকীদার অন্যতম দিক হলো কবরই শেষ নয়। যারা পরকালে বিশ্বাস

করে না, তারাই কেবল বলে থাকে কবরই শেষ। তারপর আর কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ۝﴾ [التكاثر: ١، ٢]

“প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।” [সূরা তাকাছুর, আয়াত: ১-২]

জনৈক গ্রাম্য লোক আয়াতটি শুনার পর বলল, আল্লাহর শপথ ভ্রমণকারী কখনো স্থায়ী বসবাসকারী হতে পারে না। মোটকথা কবরকে শেষ নিবাস বলা যাবে না বরং কবর থেকে পুনরুত্থান হবে এবং কিয়মাতের দিন বিচার ফয়সালা হওয়ার পর জান্নাত বা জাহান্নামই হবে শেষ নিবাস।

প্রশ্ন: (১১৮) নাসারাদেরকে ‘মাসীহী’ বলা কি ঠিক?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের পর, খৃষ্টানদেরকে মাসীহী বলা ঠিক নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে মাসীহী হত, তাহলে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করত। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনয়ন এবং ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনয়ন একই কথা। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذۡ قَالَ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُم مُّصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ قَالُواْ هَٰذَا سِحۡرٞ مُّبِينٞ ۝﴾ [الصف: ٦]

“স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মারইয়ামতনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি এমন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমণ করবেন। তাঁর নাম হবে আহমাদ। অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমণ করেন, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য এক জাদু।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৬]

ঈসা আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমণের সুসংবাদ এ জন্য দিয়েছেন, যাতে তারা তাঁর আনিত দীন গ্রহণ করে। কেননা কোনো বিষয়ের সুসংবাদ দেওয়ার অর্থই হলো তা গ্রহণ করা। ঈসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে যার আগমণের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। -প্রমাণসহ আগমণ করলেন, তখন তারা তাঁর সাথে কুফুরী করল এবং জাদুকর বলে উড়িয়ে দিল। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কুফুরী করার মাধ্যমে তারা ঈসার সাথেও কুফুরী করল। কারণ, একজন নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকে অস্বীকার করা। তাই খৃষ্টানদের জন্য কখনো ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী হওয়ার দাবী করা বৈধ নয়। তারা যদি সত্যিকার অর্থে ঈসা নবীর অনুসারী হত, তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর প্রদত্ত সুসংবাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করত। ঈসাসহ সকল নবীর নিকট থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٨١﴾ [ال عمران: ٨١]

“এবং আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যখন তোমাদেরকে কিতাব এবং জ্ঞান দান করব, অতঃপর যদি তোমাদের কাছে এমন একজন রাসূল আগমণ করেন, যিনি তোমাদের কিতাবকে সত্যায়ন করেন, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করলে এবং এ শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিলে? তখন তাঁরা বললেন, আমরা অঙ্গীকার করলাম। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮১]

যিনি তাদের কিতাবকে সত্যায়নকারী হিসেবে আগমণ করেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾ [المائدة: ٤٨]

“আর আমরা এ কিতাবকে নাযিল করেছি, যা হকের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণবহনকারী এবং ঐসব কিতাবের সংরক্ষক। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহর অবতারিত এ কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর। তুমি যা প্রাপ্ত হয়েছ তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করো না”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৪৮]

অত্র আয়াতে রাসূল বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা খৃষ্টানদের জন্য ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মত হওয়ার দাবী করা ঠিক নয়। কারণ, তারা ঈসা আলাইহিস সালামএর সুসংবাদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার অর্থ ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করা।

প্রশ্ন: (১১৯) 'আল্লাহ না করেন' এ কথাটি বলার হুকুম কী?

উত্তর: আমি এ কথাটি বলা অপছন্দ করি। কথাটিতে আল্লাহর ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। আল্লাহর ওপর কোনো কিছুর বাধ্যবাধকতা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ»

"তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন, বরং দৃঢ়তার সাথে যেন দো'আ করে এবং কবূলের আশা নিয়ে দো'আ করে। আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।"[142] আল্লাহ না করুন এর স্থলে আল্লাহ নির্ধারণ না করুন বলা অনেকটা সন্দেহ মুক্ত।

[142] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুত দাওয়াত।

প্রশ্ন: (১২০) মানুষ মারা গেলে يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً **"হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার রবের দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে" -এ কথাটি বলা কি ঠিক?**

উত্তর: এ ধরণের কথা বলা জায়েয নেই। কে তাকে সংবাদ দিল যে, সন্তুষ্ট চিত্তে সে আল্লাহর দিকে ফেরত যাচ্ছে? কাউকে এভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা কারও পক্ষে বৈধ নয়।

দীন ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এ পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তাই নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলিমে দীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জবাব প্রদান করেছেন উক্ত বইটিতে। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য উলামাদের মতামত থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব 'ফাহাদ ইবন নাসের ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান'। নাম দিয়েছেন **'ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম'**।